ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)

ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন
বাংলা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

লেখকবৃন্দ

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

মো. ইলিয়াস আহমেদ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), দাদনচক ফজলুল হক পিটিআই, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোঃ সোহেল রানা, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), রংপুর পিটিআই, রংপুর

মো: হাফিজুর রহমান, ম্যানেজার-লিটারেসি, রুম টু রিড বাংলাদেশ

সমন্বয়ক

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক সহযোগিতা

মোহাম্মদ কামরুল হাসান, এনডিসি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

দিলরুবা আহমেদ, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

সাদিয়া উম্মূল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সার্বিক তত্ত্বাবধান

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

প্রচ্ছদ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৬

মুখবন্ধ

শিক্ষা একটি চলমান ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষা ব্যক্তির আচরণে ইতিবাচক ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তার সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করে এবং তাকে দক্ষ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি দেশ ও জাতির উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলা। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ১০ মাস মেয়াদি **ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম** পরিচালিত হচ্ছে। এটি কোনো চাকরিকালীন বা চাকরিসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম নয়। বরং এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক।

ডিপিএড প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হবে। অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাদর্শন, শিখনতত্ত্ব, শিক্ষার কাঠামো ও প্রশাসন, শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা-বিষয়ক সমসাময়িক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর ও বাস্তবভিত্তিক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞানের যুগপৎ সমন্বয় থাকাতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভের পাশাপাশি এ সকল বিষয়বস্তু কীভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনে উপস্থাপন করতে হবে তাও আয়ত্ত করতে পারবে। ডিপিএড প্রোগ্রামে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুশীলনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞান সরাসরি প্রয়োগ করে হাতে-কলমে অনুশীলনের সুযোগ পাবে।

এই তথ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করা যায়, এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে এবং পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, পাঠ্যপুস্তকটি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে এই প্রত্যাশা রইল।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

বাণী

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি বিকাশের পাশাপাশি তাকে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন এমন মানবসম্পদ, যারা জ্ঞাননির্ভর, মূল্যবোধসম্পন্ন এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। এই মানবসম্পদ গঠনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা, যা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের ভিত্তি রচনা করে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পেশাগত প্রস্তুতি, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়; কার্যকর শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুসংগঠিত একাডেমিক প্রস্তুতি, আধুনিক শিক্ষণ ধারণা ও পেশাগত মূল্যবোধের সমন্বয়। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার জন্য মানসম্মত একাডেমিক প্রোগ্রামের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাগত ভূমিকা পালনে সহায়ক হতে পারে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তি, শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এবং পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সমন্বিত ধারণা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষা পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এসব পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তবমুখী শিক্ষা ধারণা অর্জন করবে এবং সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা বা পরিমার্জনের সুযোগ পরিলক্ষিত হলে তা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠনমূলক পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, আমি আশা ও বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে একটি দৃঢ় ও ফলপ্রসূ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

(আবু নুর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

শিক্ষা মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও জীবনব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। এটি মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধের সমন্বিত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এবং তাকে মানবিক, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একটি জাতির সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে তার শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানের ওপর। এই শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে, যা শিশুর সার্বিক বিকাশের সূচনালগ্ন হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ, নীতিবান ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের গুণগত মানে প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশায় চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ বা পেশাগত অভিজ্ঞতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে পারেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথ বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ পেলেও পেশাগত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে শিক্ষকদের যেমন দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি তা শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে, যা বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য একটি সুদৃঢ় একাডেমিক ভিত্তি ও পেশাগত সক্ষমতাসম্পন্ন জনবলের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হতে পারে; অর্থাৎ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী জনবল তৈরি হবে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মৌলিক ধারণা, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো, শিখন প্রক্রিয়া, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান, পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

- এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সীমিত মানবীয় প্রচেষ্টার কারণে এতে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে তা সংশোধনের লক্ষ্যে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। সর্বোপরি, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং যে উদ্দেশ্যে এটি প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	বাংলা শিক্ষাক্রম	▪ বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি ▪ প্রান্তিক যোগ্যতা ▪ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ▪ শিখনফল ▪ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়	৬
২	ভাষাদক্ষতা	▪ শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব ▪ শোনা দক্ষতার বৈশিষ্ট্য ও উন্নয়ন কৌশল ▪ বলা দক্ষতার বৈশিষ্ট্য ও উন্নয়ন কৌশল ▪ পড়া দক্ষতার বৈশিষ্ট্য ও উন্নয়ন কৌশল ▪ লেখা দক্ষতার বৈশিষ্ট্য ও উন্নয়ন কৌশল	১১
৩	বাংলা ভাষার উপাদান	▪ ভাষার ধ্বনি উচ্চারণে ব্যবহৃত বাক্‌প্রত্যঙ্গসমূহের পরিচয় ▪ বাংলা ভাষার স্বরধ্বনিসমূহের সম্যক ধারণা ▪ স্বরধ্বনির প্রমিত উচ্চারণরীতি ▪ বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের সম্যক ধারণা ▪ ব্যঞ্জনধ্বনির প্রমিত উচ্চারণরীতি ▪ বাংলা বর্ণপ্রকরণ ও যুক্তবর্ণ ▪ বাংলা যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য ▪ বাংলা ভাষার শব্দ ▪ বাংলা বাক্য : পদক্রম, শ্রেণিবিভাগ, সাধু ও চলিত, প্রমিত ও আঞ্চলিক ভাষারীতি	৩০
৪	বাংলা পঠন শিখনের মৌলিক উপাদান	▪ পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা ▪ পড়তে শেখার মৌলিক উপাদান: ধ্বনি সচেতনতা, বর্ণজ্ঞান, শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা, বোধগম্যতা	৫৮
৫	লিখন শিখন	▪ প্রাক-লিখন, লেখা শেখার গুরুত্ব ও পদ্ধতি	৮১
৬	বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা	▪ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা: ছবি পড়া ও ছবির পাঠ ▪ ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি ▪ ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল ▪ গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা পঠনরীতি ▪ গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল	৮৫

৭	লিখন শিখন	▪ লিখন শিখন: সৃজনশীল লেখা, অনুচ্ছেদ লেখা শিখন ▪ বাংলা বানানের নিয়ম অনুশীলন ▪ বিরামচিহ্নের ধারণা ও প্রয়োগ অনুশীলন	১০০
৮	বাংলা ভাষা দক্ষতা মূল্যায়ন	▪ বাংলা ভাষাদক্ষতা মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল: শোনা, বলা,পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন	১১০
৯	ভাষা দক্ষতা: পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল	▪ মাতৃভাষা পাঠদানের পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ ▪ মাতৃভাষা পাঠদানের পদ্ধতি ও কৌশল অনুশীলন	১১৫
১০	ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ	▪ ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ ▪ ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণসমূহের ব্যবহার কৌশল অনুশীলন	১২২
১১	বাংলা পাঠপরিকল্পনা	▪ বাংলা পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন, উপস্থাপন ও অনুশীলন	১৩৩
১২	বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা	▪ বাংলা শিক্ষাক্রমের আলোকে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা	১৪৩

অধ্যায় ১

বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি

শিক্ষার কোনো একটি নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য পূর্বপরিকল্পনা প্রয়োজন। এ পূর্বপরিকল্পনা থেকেই শিক্ষাক্রমের ধারণার উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত এমন সব সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত কর্মতৎপরতার অনুক্রম যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয়। এর ফলে তাদের আচার-আচরণ ও মনোভাবে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত গ্রহণযোগ্য ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসে। এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রতিষ্ঠান নিজস্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করে থাকে। আবার অনেক দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়। তবে সব দেশেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এ অধ্যায়ে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব, বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি, প্রান্তিক যোগ্যতা,অর্জন উপযোগী যোগ্যতা,শিখনফল, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষকতা পেশায় শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব

শিক্ষাক্রম যেমন কোনো নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা-কার্যক্রমের মূল পরিকল্পনা, তেমনি শিক্ষকতা পেশার জন্য শিক্ষাক্রম শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং তা অপরিহার্য। শিক্ষাক্রমকে শিক্ষকের সংবিধান বলা হয়। এটি শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সময়োপযোগী, কার্যকর ও গতিশীল করার একটি পরিকল্পিত নীলনকশা। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব আরও অধিক বলা যায়। কেননা শিশুর কোন কোন বিষয়গুলো জানা বেশি প্রয়োজন তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শনাক্তকরণ, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুসারে বিষয়বস্তুর বিন্যাসকরণ, শিক্ষার্থীদের মেধা, বয়স, রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে কাজের মাত্রা নিরূপণ, সহজ থেকে কঠিন বিষয়বস্তু বিন্যাসকরণ, বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উলম্ব এবং আনুভুমিক সমন্বয় সাধন, শিক্ষকের জন্য শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি-কৌশল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশলবিষয়ক নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত থাকে। তাই শিক্ষাক্রমকে শিক্ষাব্যবস্থার হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি

বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে শিশুকে মাতৃভাষা সঠিকভাবে শেখানোর মাধ্যমে তাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পারঙ্গম করে তোলা বাংলা শিক্ষাক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুসংগঠিতভাবে মাতৃভাষা শেখানোর রুপরেখার একটি পরিকল্পনাছক হচ্ছে মাতৃভাষা বিষয়ক শিক্ষাক্রম। মাতৃভাষা শিক্ষাক্রমের এ পরিকল্পনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাষা আয়ত্তকরণ ও ব্যবহারের সর্বশেষ তথ্য ও তত্ত্বগুলোর সমন্বয় করা হয়েছে। মাতৃভাষা শিখন শেখানোর বাংলা অঞ্চলের মদনমোহন-বিদ্যাসাগর- রবীন্দ্রনাথ অনুসৃত নীতি যেমন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে তেমনি প্রতীচ্যের গঠনবাদও (Constructivism)- বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এ হিসেবে ভাষাশিক্ষায় বাক্য-শব্দ-বর্ণক্রম পদ্ধতি যেমন ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি বর্ণ-শব্দ-বাক্যক্রমও ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম এ ভাষার গঠনগত দিক শনাক্তকরণ,দৈনন্দিন জীবনে, বর্ণনা ও তথ্যপ্রদানে, ভাব প্রকাশে, যোগাযোগ স্থাপনে ভাষা ব্যবহারে শিক্ষার্থীকে দক্ষ করে তোলাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সৃজনশীলতা বিকাশে ভাষাকে শিক্ষার্থীর কাছে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে শোনা ও বলা দক্ষতার

কম চর্চা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমে প্রথম শ্রেণি থেকেই এ দুটো দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমে ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্যের ধ্বনি সচেতনতাকেও (Phonological awareness) বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদনে পড়া দক্ষতার যে দুর্বলতার চিত্র ধরা পড়েছে সে কারণে পড়ার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানা বাড়তি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পড়তে শেখা (Learn to Read) ও পড়ে শেখার (Read to Learn) পরিসর সৃষ্টি করা হয়েছে। বলাবাহুল্য ভাষার চারটি দক্ষতাই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

মাতৃভাষার এ শিক্ষাক্রম প্রণয়নকালে আশা করা হয়েছে শিশুকে অনুশীলনীমূলক কাজের ভেতর দিয়ে যতদূর সম্ভব অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ভাষার দক্ষতাসমূহ অর্জনে সহায়ক হবে। ভাষা শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাসম্ভব বাস্তব ও কর্মোপোযোগী করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাক্রমটিকে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মতৎপরতাভিত্তিক করা হয়েছে। শিখন শেখানোর ও মূল্যায়নের নির্দেশনাসমূহ যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের এ শিক্ষাক্রমের ভেতর দিয়ে শিশুর যেমন ভাষার প্রাথমিক ভিত তৈরি হবে । ভাষা শিখন ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে একীভূতকরণের ধারণাকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এ কারণে শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে বর্ণ, শব্দ, বাক্য প্রভৃতি শেখানোর উদ্যোগ সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে যাদের লিখন ক্ষমতা নেই তারা উচ্চারণের মাধ্যমে শব্দ, বাক্যের কাঠামো বুঝতে পারবে। তাছাড়া বর্ণের ব্লক দিয়ে লেখার অনুশীলন করানোর বিষয় বিবেচনা রাখা হয়েছে। কনটেন্টসমূহকে জেন্ডার সংবেদনশীলভাবে উপস্থাপনা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ভিন্ন ভাষাভাষী শিশুরা বাংলা শব্দ ও বাক্যকাঠামোর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।

ভাষা দক্ষতা চারটি:

- শোনা
- বলা
- পড়া
- লেখা

বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা

বাংলা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিবৃতি

নম্বর	বিবৃতি
১	বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
২	বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত (অডিও-ভিডিও ও অন্যান্য) প্রমিত বাংলা ভাষায় প্রশ্ন, নির্দেশ, অনুজ্ঞা, শিষ্টাচারমূলক বাক্য, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি শুনে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।
৩	বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয় শুনে তথ্য, মূলভাব ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন বুঝতে পারা।
৪	বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক, কমিক ইত্যাদি শুনে মূলভাব বুঝতে ও আনন্দ লাভ করতে পারা।
৫	বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

৬	বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত প্রমিত বাংলা ভাষায় প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির বিষয়বস্তু বুঝে অংশগ্রহণ করতে পারা এবং মতামত প্রকাশ করতে পারা।
৭	বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা ও নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারা।
৮	বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক, কমিক ইত্যাদির মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা ও নিজস্ব অনুভূতি, উপলব্ধি প্রকাশ করতে পারা।
৯	বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
১০	বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, নামফলক, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি (বাংলা হরফে মুদ্রিত, হাতে ও ডিজিটাল ডিভাইসে) লেখা পড়ে বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা।
১১	বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা।
১২	বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক বা কমিক ইত্যাদি পড়ে আনন্দ লাভ করা, বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা এবং মত প্রকাশ করতে পারা।
১৩	বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
১৪	বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির বিষয় বুঝে লিখতে পারা এবং সাধারণ পত্র, আবেদন পত্র লিখতে ও ছক, ফরম বুঝে পূরণ করতে পারা।
১৫	বর্ণনা, তথ্য ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয় বুঝে মূলভাব, নিজস্ব মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা এবং অনুরূপ রচনা লিখতে পারা।
১৬	চিত্র ও ছবি, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, ইত্যাদির বিষয়বস্তু বুঝে মূলভাব, নিজস্ব মতামত ও উপলব্ধি লিখে প্রকাশ করতে পারা এবং সৃজনশীল রচনা লিখতে পারা।

বাংলা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো

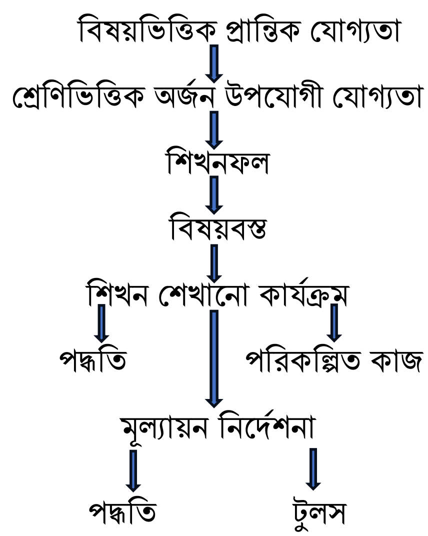

আবশ্যকীয় শিখনক্রম
বাংলা

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
ভাষা দক্ষতা : শোনা/গ্রহণ ১. বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।	১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি, নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা। ১.২ প্রমিত উচ্চারণে বলা পরিচিত শব্দ ও বাক্য মনোযোগ সহকারে শুনে বুঝতে পারা।	১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি, যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা। ১.২ প্রমিত উচ্চারণে বলা যুক্তবর্ণে গঠিত পরিচিত শব্দ ও বাক্য মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা	১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা ****	১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্যের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণ, মনযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা। ১.২ প্রমিত উচ্চারণে বলা যুক্তবর্ণ/ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাক্য শুনে বুঝতে পারা।	১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্যের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণ শুনে নতুন বাক্য গঠন করতে পারা। ****

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম
তৃতীয় শ্রেণি

বাংলা

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো কার্যাবলি		মূল্যায়ন নির্দেশনা	
				পদ্ধতি	পরিকল্পিত কাজ	পদ্ধতি	টুলস
ভাষা দক্ষতা: শোনা/গ্রহণ ১. ১ বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।	১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।	১.১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে। ১.১.২ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে। ১.১.৩ যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে। ১.২.৪ ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।	শব্দ ও বাক্যে যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ	একক কাজ জোড়ায় কাজ দলগত কাজ প্রদর্শন চেইন ড্রিল ব্যবহারিক অনুশীলন	ছবি দেখে/শুনে যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ বলা/লেখা। পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ শনাক্ত করা। বিভিন্ন শব্দে যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ শুনে নতুন শব্দ গড়া। পাঠ থেকে/চিত্র দেখে যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ বলা/লেখা। শিক্ষককে অনুসরণ করে ছবি, শব্দকার্ড, বাক্য কার্ড দেখে যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ বলা/লেখা। অডিও ক্লিপ শুনে/ভিডিও ক্লিপ দেখে বাক্যে যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ শনাক্ত করা। পাঠের যুক্তবর্ণ দিয়ে পাঠ বহির্ভূত নতুন শব্দ শুনে ভেঙে দেখানো। চেইন ড্রিল।	পর্যবেক্ষণ মৌখিক লিখিত	প্রশ্নমালা চেকলিস্ট

অধ্যায় ২

ভাষাদক্ষতা

ভাষা হলো যোগাযোগ সাধনের উপায় । আদিকালেই মানুষকে জীবন-ধারণের জন্য দলবদ্ধ হতে হয়। জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের যেমন একত্রে বাস করতে হতো তেমনি খাদ্য আহরণ ও বৃহৎ পশু শিকারে যৌথভাবে কাজ করতে হয়েছিল। যৌথ কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি যোগাযোগ মাধ্যমের, যাতে একে অপরের নির্দেশনাটি বুঝতে পারে। এজন্য তারা সৃষ্টি করেছিল পরস্পরের কাছে বোধগম্য ধ্বনি-সংকেতের। এ ধ্বনিমালা তারা হয়তো প্রকৃতি থেকেই গ্রহণ করেছিল। শিশিরকুমার দাশের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ের ধ্বনিমালা সীমিত থাকার কারণে যোগাযোগ স্থাপনের পরিসর ছিল সীমিত। এই সময়ের ভাষাকে বলা যেতে পারে 'বদ্ধভাষা' এই সীমিত ধ্বনিমালার বহুমাত্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা এবং তার মধ্যে অর্থ আরোপের দক্ষতার কারণে বদ্ধভাষা ক্রমশ মুক্তভাষায় পরিণত হয়। সম্ভবত এভাবেই সৃষ্টি হয় ভাষার। বিভিন্ন অঞ্চলে সৃষ্ট ভাষাসমূহ ক্রমান্বয়ে সুসংহত রূপ লাভ করেছে। এ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীগণ মানব যোগাযোগ ও শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব, ভাষার চারটি দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া, লেখার বৈশিষ্ট্য ও উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

মানব যোগাযোগে ভাষার গুরুত্ব

মানব যোগাযোগে ভাষার গুরুত্ব অসীম। নিজের প্রয়োজনে মানুষ ভাষা তৈরি করেছে। মানব সমাজেই ভাষার অস্তিত্ব, লালন ও বিকাশ। সুতরাং মানব জীবনে ভাষার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। ভাষা কেন গুরুত্বপূর্ণ তার কয়েকটি কারণ:

- ভাষা একটি দেশ বা জাতির ইতিহাস-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, উপরন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এর হস্তান্তর ঘটে ভাষার মাধ্যমে;
- মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা চেতনার প্রকাশ মাধ্যম হলো ভাষা;
- সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি সৃজনশীল বিষয়সমূহ চর্চার মাধ্যম ভাষা;
- সভ্যতার অগ্রসরতায় ভাষার ভূমিকা অপরিসীম;
- সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও এর বিকাশে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে;
- দৈনন্দিন যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হলো ভাষা।

ভাষা ছাড়া মানুষ তার মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে না। সমাজবদ্ধ প্রাণী হিসেবে সমাজে বাস করতে হলে পারস্পরিক যোগাযোগ অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এই যোগাযোগকে অর্থবহ ও সুসংগঠিত করে তোলে ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার অনুভূতি, আবেগ, ভালোবাসা, দুঃখ, আনন্দ ও চিন্তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে। একটি ছোট সুন্দর শব্দ ইতিবাচক অনুভূতি ও মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে, যা সম্পর্কের বন্ধনকে আরও বেশি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে সক্ষম। ব্যক্তিগত বা সামাজিক সম্পর্ক-ভাষা সেই সম্পর্কের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। পারিবারিক সম্পর্ক থেকে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাষা অপরিহার্য।

মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান ভাষার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়। বিদ্যালয়ের পাঠদান, গবেষণা, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান-সবকিছু ভাষার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ ও বিস্তরণ হয়। ভাষা না থাকলে জ্ঞান অর্জন, বিনিময় বা বিস্তার সম্ভব হতো না। শিশু ভাষা দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটায়, চিন্তা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যুক্তিবোধ গড়ে ওঠে। তাই ভাষাকে জ্ঞান ও বুদ্ধিবিকাশের মূল চাবিকাঠি বলা যায়। একটি জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও স্বকীয়তা বহন করে ভাষা। লোকসাহিত্য, প্রবাদ-প্রবচন, গল্প, কবিতা, ইতিহাসের মধ্য দিয়ে

একটি জাতির আত্মপরিচয় ভাষায় সংরক্ষিত থাকে। শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, ভাষা একটি জাতির অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদার প্রতীক। ভাষা মানুষের জাতীয় পরিচয়, আবেগ ও গর্বের মূল ভিত্তি। ভাষা ইতিহাসও প্রমাণ করে, ভাষা মানুষের আত্মার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আধুনিক বিশ্বের প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগেও ভাষার গুরুত্ব অসীম। প্রযুক্তির এই যুগে তথ্যের আদান-প্রদান, সামাজিক মাধ্যম, অনলাইন শিক্ষা, ভিডিও কনফারেন্স-প্রতিটি জায়গায় ভাষার প্রয়োগ হচ্ছে নতুন মাত্রায় ও গতিতে। মানব সভ্যতা বিকাশের অগ্রযাত্রায় এক অনন্য, অপরিহার্য এবং প্রাণময় শক্তি হলো ভাষা।

শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব

শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত সফলতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি শিশুর মানসিক, আবেগিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাতৃভাষা জ্ঞান অর্জনের প্রথম ধাপ এবং বহুভাষা শিক্ষার জন্য শক্ত ভিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই স্বীকৃত। ইউনেস্কো ঘোষণা করেছে যে, শিশুর শিক্ষার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো তার মাতৃভাষা। যে জাতি মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে পেরেছে, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং গবেষণায় দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস রয়েছে, যা আমাদের ভাষার মর্যাদা ও শিক্ষায় এর অপরিহার্যতা আরও সুদৃঢ় করেছে। মাতৃভাষায় শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর বুনিয়াদ স্থায়ী হয়।

শিশুর যথাযথ বিকাশে মাতৃভাষা

- মাতৃভাষায় শিক্ষা শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সহজে ও স্বাভাবিকভাবে বুঝতে সহায়তা করে;
- শিক্ষার্থীর শেখার প্রতি আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে;
- মাতৃভাষাভিত্তিক শেখা শিক্ষায় আনন্দ সৃষ্টি করে;
- শিক্ষার্থীর চিন্তা, অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ সহজ হয়;
- ভুলের ভয় কমে, প্রশ্ন করার সাহস বৃদ্ধি পায়, এজন্য আত্মবিশ্বাস বাড়ে;
- ভাষা দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দ্রুত উন্নত হয়;
- সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ে;
- শিক্ষার ভিত মজবুত করে ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ সহজ করে;
- শিক্ষার্থীর শেখার গতি বৃদ্ধি পায়, কারণ শিক্ষার্থী পরিচিত তথ্য মাতৃভাষায় দ্রুত ধারণ করতে পারে;
- শিক্ষার্থী -শিক্ষক যোগাযোগ আরও হৃদ্যতাপূর্ণ হয়;
- নির্দেশনা স্পষ্ট হওয়ায় শ্রেণিকক্ষে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা কমে;
- ভাষাগত অস্পষ্টতা না থাকায় জটিল ধারণাও সহজে ব্যাখ্যা করা যায়;
- মাতৃভাষার ওপর দক্ষতা ভবিষ্যৎ সময়ে বিদেশি ভাষা শেখাও সহজ করে।

শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম নয়, মাতৃভাষা সাংস্কৃতিক পরিচয়, চিন্তাশক্তি, মানসিক বিকাশ, জাতীয় চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধের বাহক। তাই দক্ষ, সৃষ্টিশীল, মানবিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে তুলতে মাতৃভাষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পরেই একজন মানুষ ভাষার গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষমতা এবং প্রয়োগের দক্ষতা

অর্জন করে না। শিশুর ভাষাকে চেনার জগৎ মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে। কারণ শিশু যখন প্রথম শব্দটি উচ্চারণের চেষ্টা করে পরিবারের সদস্যদের সাহায্যেই তখন সেটি সম্ভব হয়। যেমন- শিশু যখন ম-ম-ম ধ্বনিটি উচ্চারণের চেষ্টা করে তখন মা মনে করেন শিশুটি মা বলার চেষ্টা করছে। তখন তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং শিশুটিকে আদর করেন। এতে শিশুটি উৎসাহবোধ করে। এভাবে পরিবারের অন্য সদস্যদের সম্বোধনসূচক শব্দ শেখাতে সকলে উৎসাহিত হন। তখন শিশুটি ভাঙা ভাঙা শব্দ বলতে শেখে। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে যেসব শব্দ বিনিময় করেন শিশু তাই অনুসরণ করে। পরিবারের সদস্যরা যখন পানিকে পানি বলে চিহ্নিত করেন তখন শিশুটিও বুঝতে পারে তার 'মাম' বস্তুটির আসল নাম 'পানি'। কিংবা জানালার পাশে বসা প্রাণীটির নাম কাক। অর্থাৎ জীবন ও জগতের প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। এর ভেতর দিয়ে অর্জিত পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করেই শিশুটি এক সময় সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিসরে প্রবেশ করে।

ভাষার চারটি দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া ও লেখা । প্রথম দুটি শোনা ও বলা দক্ষতা। শৈশব থেকে পারিবারিক পরিবেশে শোনা ও বলা দক্ষতা গড়ে ওঠে। সে মূলত মা-বাবা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের ধ্বনি শুনে তা অনুকরণের মাধ্যমে বলতে শেখে। প্রসঙ্গত নোয়াম চমস্কি শিশুর ভাষাবোধের ভিত্তি হিসেবে 'পরিবারের ভাষা' বুঝিয়েছেন। তার ধ্বনিমূলগুলো গঠিত হয় পরিবার থেকে। তবে এই দুটি দক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে প্রাতিষ্ঠানিক শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শোনা ও বলা দক্ষতা পারিবারিক পরিবেশে সূচনা হলেও পড়া ও লেখা দক্ষতার সূত্রপাত ঘটে প্রতিষ্ঠানে। এ অবস্থায় শিশুর মাতৃভাষা যদি স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম হয়ে থাকে তাহলে শিশুর পক্ষে ভাষার এ চারটি দক্ষতা অর্জন সহজতর হয়। কিন্তু স্কুলের ভাষা যদি ভিন্ন হয় তাহলে তাকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। অভিবাসী শিশুদের ক্ষেত্রেও এমনটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশু স্কুলে যেতে উৎসাহিত নাও হতে পারে। যথেষ্ট সহযোগিতা না পেলে শিশু অসামাজিক, আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। স্কুলে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়তে পারে। এজন্য সারা বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে উৎসাহিত করা হয়।

ভাষাদক্ষতার ধারণা

ভাষা ব্যবহারিক এবং সামাজিক বিষয়। সামাজিক জীব হিসেবে আমরা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে একে অন্যের সাথে ভাব বিনিময় করি। এই ভাব বিনিময়কে যোগাযোগ বলতে পারি। যোগাযোগের ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে সাধারণত মৌখিকভাবে কিংবা লিখিতরূপে তথ্যের আদান-প্রদান করে থাকি। মৌখিকভাবে যোগাযোগ ঘটে বলা-শোনার মাধ্যমে এবং লিখিতরূপে ঘটে লেখা-পড়ার মাধ্যমে। যেমন-শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বলেন শিক্ষার্থীরা শোনে, শিক্ষার্থী বলে শিক্ষক শোনেন। আবার শিক্ষক বোর্ডে লেখেন শিক্ষার্থীরা সে-লেখা পড়ে, শিক্ষার্থী খাতায় বা বোর্ডে লেখে শিক্ষক তা পড়েন। এই বলা-শোনা এবং লেখা-পড়ার মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণ ঘটে অর্থাৎ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মানুষের পারিবারিক, সামাজিক কিংবা কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ জীবনের সর্বত্র যোগাযোগ চলে। সঠিকভাবে তথ্যের আদান-প্রদান কিংবা ভাব বিনিময় বা যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ভাষাদক্ষতা অপরিহার্য। ভাষাদক্ষতা বলতে সাধারণত ভাষা ব্যবহারের পারদর্শিতা বা ক্ষমতাকে বোঝায়। আসলে ভাষাদক্ষতা হচ্ছে নির্দিষ্ট ভাষায় কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারা। অর্থাৎ বলে শ্রোতাকে বোঝাতে পারা, শুনে বুঝতে পারা, পড়ে বুঝতে পারা এবং লিখে প্রকাশ করতে পারা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভাষার চারটি দক্ষতা রয়েছে। যেমন-

- শোনা
- বলা
- পড়া

- লেখা

বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বলা এবং লেখা হচ্ছে প্রকাশমূলক ভাষাদক্ষতা। কারণ, বলা এবং লেখার সময় চিন্তা করতে হয়। আমরা যখন বলি অথবা লিখি তখন আসলে বক্তব্য বা কথা সৃষ্টি করি। মানুষ যে কথা সৃষ্টি করে তার বড় প্রমাণ হলো গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি। অর্থাৎ অন্যের কাছে আমাদের চিন্তা-ভাবনা আবেগ-অনুভূতি, দর্শন প্রভৃতি প্রকাশ করি। অনুরূপভাবে আবার আমরা যখন লিখি তখনও আসলে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, দর্শন প্রভৃতি লিখে প্রকাশ করি। অর্থাৎ এখানেও কথা সৃষ্টি করি বা উৎপাদন করি। বলা এবং লেখায় পার্থক্য কেবল রূপগত। একটি ভাষার লিখিতরূপ আর একটি ভাষার মৌখিক রূপ। শোনা এবং পড়া হলো গ্রহণমূলক ভাষাদক্ষতা। কারণ যখন কারও বক্তব্য শুনি তখন আসলে শ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো না কোনো তথ্য পাই এবং সংগ্রহ করি। যেমন- রেডিও, টেলিভিশনের সংবাদ অথবা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তব্য শুনে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আমরা যখন কোনো লেখা পড়ি তখনও অসংখ্য তথ্য পাই। যেমন- সংবাদপত্র, চিঠি, বই ইত্যাদি পড়ে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করি। এ-কারণে শোনা এবং পড়া হলো গ্রহণমূলক ভাষাদক্ষতা।

ভাষাদক্ষতা: শোনা

শোনা বা শ্রবণ কী?

শোনা প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কান ও মস্তিষ্ক। ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি প্রথমে শ্রোতার কানে প্রবেশ করে এবং মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক এই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

শোনার আসল কথা হলো শুনে বুঝতে পারা। বক্তব্য শুনে বুঝতে না পারলে শোনা হবে না। বক্তার বক্তব্য কিংবা কোনো কথোপকথন থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহ করতে পারাকে শোনা বলে। শুনে বুঝতে না পারলে যেমন যোগাযোগ অসম্ভব হয়ে ওঠে তেমনি তথ্য ও তত্ত্বগত দিক থেকেও লাভবান হওয়া যায় না। সাধারণত শোনা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। দ্বিমুখীভাবে বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে আলাপচারিতা চলে। অর্থাৎ একজন বলেন অন্যজন শোনেন।

বক্তা শ্রোতা (বক্তা বলেন শ্রোতা শোনেন)

শ্রোতা বক্তা (শ্রোতা বক্তা হয়ে ওঠেন আর বক্তা হয়ে যান শ্রোতা)

শোনা আবার একমুখীও হতে পারে। যেমন-রেডিও, টেলিভিশনের খবর শোনা। এখানে তাৎক্ষণিকভাবে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ থাকে না। শ্রোতা কেবলমাত্র শোনার সুযোগ পান। বক্তার বক্তব্যর ওপর কোনো কিছু বলার বা প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে না। শোনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পন্থা হলো, বক্তার বক্তব্য বাধাগ্রস্ত না করে তাঁকে বলার সুযোগ দেওয়া এবং সতর্কতার সাথে বক্তব্য শোনা। শ্রোতার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তা বক্তার বক্তব্য শেষে জিজ্ঞেস করাই ভালো। বক্তার বক্তব্যের মাঝে তাকে বিব্রত কিংবা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। অর্থাৎ একজন বলবেন এবং অন্যজন শুনবেন। এভাবেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ কারণে বলা হয়, একজন ভালো শ্রোতা সাধারণত একজন ভালো বক্তা। কেননা ভালো করে না শুনলে ভালো বলা যায় না।

শোনার বৈশিষ্ট্য

১. শোনা একটি গ্রহণমূলক ভাষিক দক্ষতা;

২. শোনা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া, আবার একমুখীও হতে পারে;

৩.শোনার সাথে মস্তিস্ক ও শ্রবণেন্দ্রিয় (কান) জড়িত;
৪. একজন ভালো শ্রোতা সাধারণত একজন ভালো বক্তা।

শোনার প্রকারভেদ

শোনা দুই ধরনের-

ক. উদ্দেশ্যমুখী শোনা এবং
খ. নৈমিত্তিক শোনা

ক. উদ্দেশ্যমুখী শোনা

উদ্দেশ্যমুখী শোনা হলো শ্রোতা যখন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনোযোগসহকারে বক্তার বক্তব্য শোনে এবং প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করে। যেমন- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনে এবং প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো খাতায় লিখে নেয়। এখানে শিক্ষার্থীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিক্ষকের বক্তব্য শোনে। কারণ শিক্ষকের প্রদত্ত বক্তব্য শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-ভান্ডার সমৃদ্ধ করে এবং তাদেরকে মূল্যায়নের ওপর এর প্রভাব রয়েছে।

খ. নৈমিত্তিক শোনা

উদ্দেশ্যহীনভাবে আমরা যখন কারও বক্তব্য শুনি তখন সেটা হয়ে ওঠে নৈমিত্তিক শোনা। প্রতিদিনই আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য ও কথোপকথন শুনে থাকি। এই ধরনের শোনার ক্ষেত্রে শ্রোতার মনোযোগ প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকে না। নৈমিত্তিক শোনায় কাঙ্ক্ষিত কোনো তথ্য সংগ্রহ করার মানসিকতাও এখানে বর্তমান থাকে না। যেমন-শিক্ষকের বক্তব্য শোনার সময় শ্রেণিকক্ষের বাইরের কোনো ঘোষণা শোনা। রাস্তা-ঘাটে চলার সময় অথবা কোনো আড্ডায় অনেক বক্তার কথাই আমরা শুনে থাকি। তবে নৈমিত্তিক শোনা কোনো গুরুত্ব বহন করে না তা কিন্তু নয়। নৈমিত্তিক শোনার মাধ্যমেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে ও তথ্য-ভান্ডার সমৃদ্ধ করে। যেমন- মার্কেটে শপিং করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ রাস্তায় ঘোষণা শোনা গেল যে, অনিবার্য কারণবশত আজ মার্কেট বন্ধ। এই তথ্যটা ঐ ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শোনার গুরুত্ব

ভাষাদক্ষতাগুলোর মধ্যে শোনা দক্ষতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ তথ্য আমরা শোনার মাধ্যমে পাই। দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে আমরা এ-তথ্য ব্যবহার করি। অনেক সময় পড়ে তথ্য পাওয়ার সুযোগ হয় না, সেক্ষেত্রে কারও কাছ থেকে তথ্যগুলো শুনে পাওয়ার চেষ্টা করে থাকি। যেমন- রেডিও, টেলিভিশনের সংবাদ, সতর্কীকরণ প্রভৃতি শুনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্ষেত্রে মনোযোগসহকারে শোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ধ্বনির সঠিক উচ্চারণে শোনার ভূমিকা অপরিসীম। কেননা শ্রেণিতে শিক্ষকের বক্তব্যই শিক্ষার্থীরা শোনে এবং শেখে। শিক্ষার উঁচুস্তরের শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে শিক্ষকের বক্তব্য শোনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এবং তথ্য ও তত্ত্বগতভাবে লাভবান হয়ে ওঠে। সতর্কভাবে শোনার মাধ্যমে বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগও বৃদ্ধি পায়।

শ্রেণিকক্ষে শোনার দক্ষতা অনুশীলনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার্থীদের শোনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণিকক্ষে শোনা অনুশীলন প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণিকক্ষে শোনা অনুশীলন আবশ্যক। কেননা প্রাথমিক স্তর ভাষা-শিক্ষার জন্য উত্তম সময়। শ্রেণিকক্ষে শোনা -দক্ষতা অনুশীলনে শিক্ষকের করণীয়-

- শোনা দক্ষতা কী এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ-এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা;
- শ্রেণিকক্ষে শান্ত ও শোনার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা;
- শোনা অনুশীলনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি, যেমন- উৎসাহ প্রদান, পুরস্কৃত করা;
- গল্প, কবিতা, অনুচ্ছেদ বা সংবাদ পড়ে শোনানো;
- শোনানো শেষে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের শোনার মাত্রা যাচাই করা;
- অডিও ও শ্রুতিলিখন ব্যবহার করে শোনার অনুশীলন করানো;
- নির্দেশনা স্পষ্টভাবে দেওয়া এবং শিক্ষার্থীদের তা অনুসরণ করানো;
- জোড়ায় বা দলে কাজ করিয়ে একে অপরের কথা শোনার অভ্যাস তৈরি করা;
- আলোচনা বা বিতর্ক চলাকালে শিক্ষার্থীদের শোনার আচরণ পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা দেওয়া;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা;
- মনোযোগী শ্রোতাদের প্রশংসা করে শোনার স্পৃহা গড়ে তোলা;
- শ্রোতার শিষ্টাচার যেমন- অন্যের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ;
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে আকর্ষণীয় ও গল্পভিত্তিক উদাহরণ ব্যবহার করা;
- শ্রেণির পেছনের সারির শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে নজর দেওয়া যাতে তারা শোনা কার্যক্রমে বাদ না পড়ে;
- ভুল করলে শিক্ষার্থীদের সম্মান বজায় রেখে সংশোধন করা।

শ্রেণিকক্ষে শোনার অনুশীলন ও মূল্যায়ন

১. শ্রুতিলিখন

শ্রেণিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোধগম্য ও শ্রবণ উপযোগী রচনা বা রচনার অংশ ১/২ বার নির্ভুলভাবে পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পঠিত বিষয় শুনবে এবং নির্দেশিত কাজ সম্পাদন করবে। হুবহু রচনাটি লেখা, রচনার মূল বক্তব্য লেখা, নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ কিংবা প্রশ্নোত্তরও লিখতে দিতে পারেন। এরপর শিক্ষক নির্দেশিত কাজের ওপর শিক্ষার্থীদের শোনার দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।

২. গল্প বলা

গল্প বলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শোনা দক্ষতার অনুশীলন করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা গল্প শুনতে পছন্দ করে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠ-সংশ্লিষ্ট গল্প শোনাবেন। তারপর ঐ গল্পের ওপর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। এতে শিক্ষার্থীরা গল্পটি মনোযোগসহকারে শুনবে এবং শোনার-দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৩. বক্তৃতা

বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শোনা-দক্ষতা অনুশীলন করা যেতে পারে। সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তব্য উপস্থাপনের পর অভীক্ষাপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা বক্তব্যের বিষয় শোনার পর কতটুকু বুঝতে পারলো কিংবা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারলো কি না সেটা পরিমাপ করতে হবে। তবে বক্তৃতার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও বোধগম্য হতে হবে।

৪. আবৃত্তি

আবৃত্তির সাহায্যে শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শোনা অনুশীলন করাতে পারেন। ছড়া, কবিতা আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের নিকট একটি উপভোগ্য বিষয়। বস্তুত শিক্ষার্থীরা ছড়া, কবিতা আবৃত্তি শুনে শুনেই আবৃত্তি করতে শিখে ফেলে। শিক্ষক যথাযথভাবে ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগসহকারে আবৃত্তি শুনতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষার্থীরা শুনলো কি না এবং কতটা বুঝতে পারলো শিক্ষক তা মূল্যায়ন করবেন।

৫. কথোপকথন

শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথোপকথন বা আলাপচারিতার মাধ্যমে শ্রেণিতে শোনা দক্ষতা অনুশীলন করাতে পারেন। দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যখন কথোপকথন চলবে তখন অন্য শিক্ষার্থীরা তাদের কথোপকথন শুনবে। কথোপকথন শেষে শিক্ষক শ্রোতা শিক্ষার্থীদের ঐ কথোপকথনের বিষয়ের ওপর শোনা দক্ষতা পরিমাপ করবেন।

ভাষাদক্ষতা: বলা

বলা কী?

ভাষার মৌখিক রূপ হলো বলা। পারস্পারিক যোগাযোগের একটি প্রক্রিয়া। বলার সময় আমরা সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করি। একজনের সাথে আরেকজনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে বলার মাধ্যমে। সাধারণত এর মধ্যে কোনো মাধ্যম থাকে না। আবার দূরবর্তী স্থানে প্রয়োজনে আমরা টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশনে যোগাযোগ করতে পারি। সেক্ষেত্রে টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশন মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। একজন বলার সাথে সাথেই অন্যের মনের মধ্যে উত্তর তৈরি হয়ে যায়। বলার আগে আমাদের মাথায় চিন্তা হয় এবং সেই চিন্তার প্রকাশ ঘটে বলার মধ্য দিয়ে। বলার মধ্য দিয়ে আচরণ প্রকাশ পায়। তাই বলা হয় কথাই মানুষের আচরণ। এর মধ্য দিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতারও প্রকাশ ঘটে। বলার বিষয়টা আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে। বলা আমাদের চিন্তা-ভাবনা এবং কল্পনার দিগন্তকে প্রকাশ করে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ ফুটে ওঠে। বলা এক ধরনের সৃজনশীল প্রকাশ এবং একটি শিল্প।

বলার বৈশিষ্ট্য

১. বলা ভাষার একটি উৎপাদনমূলক/ প্রকাশমূলক দক্ষতা;
২. বলার মধ্য দিয়ে আচরণ ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়;
৩. বলা এক ধরনের শিল্প;

৪. বলার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতা প্রকাশ পায় ও ব্যক্তিত্ববোধ ফুটে ওঠে।

বলার প্রকারভেদ

বলা সাধারণত দুপ্রকার।

ক. আনুষ্ঠানিক বলা

খ. অনানুষ্ঠানিক বলা

ক. আনুষ্ঠানিক বলা

আনুষ্ঠানিক বলা পূর্ব পরিকল্পিত। বলার বিষয়, স্থান এবং সময় সুনির্দিষ্ট থাকে। আমরা যখন আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে এবং প্রস্তুতি নিয়ে বলি তখন সেটা হলো বলার আনুষ্ঠানিক রূপ। কমিটি কেন্দ্রিক আলোচনা, প্যানেল আলোচনা, সংলাপ, গোলটেবিল বেঠক, সেমিনার, সাক্ষাৎকার, বির্তক, রেডিও এবং টেলিভিশনে বলা, শ্রেণিকক্ষে বলা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক বলার বিভিন্ন রূপ।

খ. অনানুষ্ঠানিক বলা

অনানুষ্ঠানিকবলার ক্ষেত্রে বিষয়, শ্রোতা ও সময় পূর্বনির্ধারিত থাকে না। হঠাৎ কোনো জায়গায় কারও সাথে আলাপ করা, পরিবারের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বলা, আড্ডায় বন্ধুদের সাথে অনির্ধারিত বিষয়ে আলাপচারিতা ইত্যাদি বলার অনানুষ্ঠানিক রূপ। অর্থাৎ বিষয়ের ওপর পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বলা।

বলার গুরুত্ব

ব্যক্তির সামাজিক উন্নয়নে বলার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ আমাদের প্রয়োজন মেটায়। সমাজের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য এবং সমাজকে কিছু দেওয়ার জন্য বলা প্রয়োজন। বলার মধ্যদিয়ে মানুষের যে চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটে, তাতে সমাজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও উপকৃত হয়। বলার মধ্যদিয়ে যে সকল তথ্যের আদান-প্রদান ঘটে তা সমাজের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান ঘটায় এবং তত্ত্বগতভাবে আমরা লাভবান হই। বলার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের সমস্যা তুলে ধরতে পারি এবং অন্যের সমস্যারও সমাধান দিতে পারি। বলার মাধ্যমে আমাদের ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে বলা অত্যন্ত কার্যকর। বলার মধ্যদিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

বলার দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল: ভালো বক্তার দু'ধরনের দক্ষতা থাকতে হয়-

ক. শারীরিক দক্ষতা

শারীরিক দক্ষতা জন্মগত। ভালো বলতে হলে প্রথমে শারীরিকভাবে সুস্থ ও ভালো থাকতে হবে। শারীরিকভাবে ভালো না থাকলে অথবা কন্ঠ ভালো না থাকলে ভালো বলা যায় না।

খ. অনুশীলনের দক্ষতা

কতকগুলো বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করে একজন ভালো বক্তা হওয়া যায় এবং বলার দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। যেমন:

- কণ্ঠের ব্যবহার এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে কথাগুলো সবাই ভালোভাবে শুনতে এবং বুঝতে পারে;

- বলার আগে ভাবকে ঠিকমত নির্বাচন করা এবং গুছিয়ে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বলা;
- এমন ধরনের শব্দ এবং বাক্য ব্যবহার করা যাতে ভাবটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়;
- বলার সময় অঙ্গভঙ্গি যেন প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ হয়;
- পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে বলতে হয়;
- বলার সময় সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিবেচনা করা;
- প্রয়োজনবোধে উপকরণ ব্যবহার করা।

শ্রেণিতে বলা অনুশীলনে শিক্ষকের ভূমিকা

বলা একটি শিল্প, একটি দক্ষতা। বলা মানে অনর্থক অতি কথন নয়। বলার দক্ষতা এমনি এমনি আসে না। এর জন্য অনুশীলন করা প্রয়োজন। অনুশীলনের মাধ্যমে বলা দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষ একটি আদর্শ জায়গা। এখানে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বলা-দক্ষতা অর্জন শিক্ষক-কেন্দ্রিক।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বলা-দক্ষতা অনুশীলনে শিক্ষকের ভূমিকা:

- শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিকভাষা পরিহার করে প্রমিতভাষায় বলা, কারণ শিক্ষকের ভাষা শুনে এবং তাঁকে অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরা ভাষা শেখে;
- শিক্ষার্থীদের বলার জন্য শিক্ষকের উৎসাহ প্রদান;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার না করে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীর উচ্চারণে ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং সঠিক উচ্চারণে সুস্পষ্টভাবে বলতে সহায়তা করা;
- গুছিয়ে সাবলীলভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে শেখানো;
- সহজ ভাষায় শ্রবণযোগ্য স্বরে বলতে শেখানো;
- বলার সময় ভাষা-দূষণ অর্থাৎ সাধু-চলিত ও আঞ্চলিকতার মিশ্রন যেন না ঘটে সে ব্যাপারে সচেতন করা;
- শিক্ষার্থীদের বলার সময় প্রাসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি করতে শেখানো।

শ্রেণিকক্ষে বলা অনুশীলন ও মূল্যায়ন

১. কথোপকথন

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথোপকথন বা আলাপচারিতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিতে বলা অনুশীলন করাতে পারেন। দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যখন কথোপকথন চলবে তখন অন্য সকল শিক্ষার্থী তাদের কথোপকথন শুনবে। কথোপকথন চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঐ কথোপকথনের বিষয়ের ওপর এবং শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দিকের ওপর লক্ষ রাখবেন।

কথোপকথন মানে অনর্গল কথা বলা নয়। প্রত্যেক বক্তা বক্তব্যের বিষয় সম্পর্কে কিছু না কিছু বিষয়গত চিন্তা-ভাবনার অবদান রাখেন এবং পরস্পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এটা হলো মূলত পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় উদ্ধারের জন্য যোগাযোগ। কথোপকথনের সময় আলাপকারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক থাকতে হয়। আচরণগত শিষ্টাচার বজায় রেখে বলতে হয়। যারা খুব ভালো বলেন তারা খুব দায়িত্ববান, সত্যনিষ্ঠ এবং সহনশীল ও ধৈর্যশীল হন। বলার সময় উগ্রতা পরিহার করে যুক্তিবাদী হতে হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা কথোপকথনের মূলকথা।

২. গল্প বলা

গল্প বলার মাধ্যমে শ্রেনিকক্ষে বলা অনুশীলন করা যেতে পারে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের গল্প বলতে বলবেন। গল্প বলার সময় শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা, শব্দের উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি ইত্যাদি মূল্যায়ন করবেন।

৩. বক্তৃতা

বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমেও শ্রেণিকক্ষে বলা অনুশীলন করা যায়। বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণের মনোভাব তৈরি হয় এবং নেতৃত্বের গুণ বৃদ্ধি পায়। তবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বক্তৃতার বিষয় হবে সহজ, আকর্ষণীয় ও সুনির্দিষ্ট। অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা বক্তৃতা করতে ভয় পায় কিংবা লজ্জাবোধ করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক তাদেরকে উৎসাহিত করে তুলবেন। বক্তৃতার বিষয়ের ভাবের ক্রমবিকাশ, আবেগ-অনুভূতি, শব্দ চয়ন, আঞ্চলিকতা, অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি ইত্যাদি দিক খেয়াল রাখতে হবে। বক্তৃতা প্রদান শেখানোর পর নির্ধারিত বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থী সঠিকভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারছে কি না তা মূল্যায়ন করতে হবে।

৪. আবৃত্তি

শিশু-শিক্ষার্থীরা ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পছন্দ করে। শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির অনুশীলন করাতে পারেন। ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের নিকট একটি উপভোগ্য বিষয়। কার্যত শিক্ষার্থীরা ছড়া, কবিতা আবৃত্তি শুনে শুনেই আবৃত্তি করতে শিখে ফেলে। শিক্ষক সুন্দর করে ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগসহকারে আবৃত্তি শুনতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা অনুরূপভাবে আবৃত্তি করতে পারছে কি না সেটা মূল্যায়ন করবেন।

৫. বিতর্ক

শ্রেণিকক্ষে বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বলাদক্ষতার উন্নয়ন করা যায়। বিতর্ক হলো এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা। বিতর্কে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বিষযের ওপর বক্তা নিজের দলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুক্তিপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। এতে করে বক্তার যুক্তিপূর্ণভাবে কথা বলার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। শ্রেণিকক্ষে বিতর্ক চলাকালে শিক্ষক বিতার্কিক শিক্ষার্থীদের বলা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করবেন।

ভাষাদক্ষতা: পড়া

পড়া কী?

যখন কোনো রচনা পড়ি তখন আসলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ঘটনা, বস্তু, বিষয় ও তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। অর্থাৎ কোনো না কোনো তথ্য পাই। আবার পড়ার মধ্যদিয়ে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগও স্থাপিত হয়। লেখকের লেখা পড়ে পাঠক হিসেবে আমরা লেখক সম্পর্কে জানতে পারি এবং আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারি।

কোনো রচনা পড়ে বুঝতে পারাকে পড়া বলে। পড়ে রচনার অর্থ উদ্ধার করতে না পারলে পড়া হয় না। ড. মাইকেল ওয়েস্ট এর ভাষায় 'পঠন হলো দৃশ্যত ধ্বনি উৎপাদন ও অর্থ উপলব্ধির মিলিত প্রক্রিয়া'। বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের রচনা পড়ি। যেমন- গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। পড়ার পর যদি আমরা পাঠের বিষয়বস্তু বুঝতে না পারি তাহলে আমাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে না। পড়ে বুঝতে পারলে পড়া কার্যকর হয়ে ওঠে এবং আমরা এক ধরনের পরিতৃপ্তি লাভ করি। অতএব পড়ার আসল কথা হলো রচনা পড়ে বুঝতে পারা।

পড়ার বৈশিষ্ট্য

১. পড়া একটি গ্রহণমূলক ভাষিক দক্ষতা;
২. পড়া একটি শিল্প;
৩. পড়ার সাথে মস্তিষ্ক ও দর্শনেন্দ্রিয় চোখ জড়িত;
৪. পড়া সরব ও নীরব প্রক্রিয়া।

পড়ার উদ্দেশ্য

পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য দুটি। যেমন-

১. আনন্দ পাওয়ার জন্য
২. তথ্য পাওয়ার জন্য।

১. আনন্দ লাভের জন্য পড়া

পাঠকের চিত্তবিনোদনই এই পড়ার মূল উদ্দেশ্য। পড়ার মধ্যদিয়ে পাঠক বিষয়বস্তুর রস আস্বাদন করে এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে। সাহিত্যধর্মী রচনা আনন্দ লাভের জন্য পড়ার প্রধান বিষয়বস্তু। এই ধরনের পড়ায় তথ্য সংগ্রহ মূল উদ্দেশ্য থাকে না।

২. তথ্য পাওয়ার জন্য পড়া

পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ এবং জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা অর্থাৎ জ্ঞান অন্বেষণই এই পড়ার আসল কথা। সাধারণত প্রবন্ধধর্মী এবং তথ্যবহুল রচনা এই ধরনের পড়ার বিষয়বস্তু।

তবে আনন্দ লাভের জন্য যে পড়া সেখানেও তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য পাওয়ার জন্য পড়াও আবার আনন্দ পাওয়া যায়। এখানে পার্থক্য হলো আনন্দ লাভের জন্য পড়ায় আনন্দ লাভ মূখ্য এবং তথ্য সংগ্রহ গৌণ। অন্যদিকে তথ্য পাওয়ার জন্য পড়ায় তথ্য সংগ্রহ মূখ্য এবং আনন্দ লাভ গৌণ।

পড়ার দক্ষতা

- রচনা পড়তে পারা অর্থাৎ রচনার ভাষাগত দিক জানা;
- অর্থবোধ করা, অজানা শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বাক্যের অর্থ জানা;
- বাক্য থেকে বাক্যগুচ্ছ, স্তবক থেকে স্তবকের সম্পর্ক বোঝা;
- তথ্য থাকলে তথ্যের দিকগুলো বোঝা এবং আবেগ-অনুভূতি থাকলে তা বোঝা;
- রচনার ধারণাগত দিক বুঝতে পারা;
- রচনার লক্ষ্য বুঝতে পারা;

- রচনার মূলভাব ধরতে পারা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বুঝতে পারা;
- সমগ্র রচনায় বিভিন্ন সহায়ক বিবরণ থেকে মূলভাবকে বের করে আনতে পারা;
- রচনায় মূল অংশগুলো চিহ্নিত করতে পারা;
- অনুসন্ধান ও বাছাই করে পড়তে পারা।

পাঠের প্রকারভেদ

ধরন অনুসারে পাঠ দুই প্রকার-

১. সরব পাঠ এবং

২. নীরব পাঠ।

১. সরব পাঠ

বাগযন্ত্র ব্যবহার করে অর্থাৎ কণ্ঠনালীস্থিত ঝিল্লীর তন্ত্রীতে অনুরণন সৃষ্টি করে যে পাঠ করা হয় তাকে সরব পাঠ বলে। তবে বাগযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দ করে পড়লেই সরব পাঠ হয় না। এর কিছু বিশেষ শর্ত রয়েছে। যেমন:

- ধ্বনি ও শব্দের সুস্পষ্ট ও যথার্থ উচ্চারণ;
- কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ;
- বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার;
- শ্বাসাঘাতের যথাযথ প্রয়োগ;
- বিষয়বস্তুর অনুভূতি ও আবেগের পাঠে প্রতিফলন;
- অনাবশ্যক দ্রুত পাঠ পরিহার;
- অনাবশ্যক জোরে উচ্চারণ পরিহার।

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সরব পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে সরব পাঠ অত্যন্ত কার্যকর। শুদ্ধ উচ্চারণ ও আদর্শ ভাষা-ব্যবহার-শিক্ষা সরব পাঠের মাধ্যমে আয়ত্ত করা যায়। এতে মুখের জড়তা কেটে যায় এবং উচ্চারণে স্পষ্টতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পাঠে ছন্দ ও যতিচিহ্নগুলোর যথাযথ প্রতিফলন হয়। ফলে এটি শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তবে সরব পাঠের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন- ছন্দ ও যতি বিন্যাসের নিয়মগুলো না জানলে সঠিক সরব পাঠ করা প্রায় অসম্ভব। সরব পাঠে ভুল উচ্চারণ অভ্যাস হয়ে গেলে পরে তা সংশোধন করা কঠিন হয়ে ওঠে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা সবাই এক সাথে সরব পাঠ করলে কোলাহল তৈরি হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদেরকে এক সাথে সরব পাঠ করাতে পারেন।

আদর্শ সরব পাঠে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

শ্রেণিকক্ষে আদর্শ সরব পাঠে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন-

- ধ্বনি ও শব্দের শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ;
- ছন্দ ও যতি চিহ্নের প্রতি লক্ষ রেখে সরব পাঠ;
- সরব পাঠের সময় শ্বাসাঘাত ও বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ রীতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান;

- সরব পাঠ নিম্নস্তরের শ্রেণিগুলোতে খুব বেশি প্রয়োজন। তবে শিক্ষার্থীদের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা যত বাড়বে, সরব পাঠ তত কমিয়ে নীরব পাঠের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা;
- ছড়া ও কবিতার ক্ষেত্রে সরব পাঠ অপরিহার্য করে তোলা;
- সরব পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের মনোসংযোগ আকৃষ্ট করা;
- সরব পাঠের মধ্য দিয়ে লেখকের অনুভূতি ও বিষয়বস্তু আবেগকম্পিত স্বরে প্রকাশ;
- সরব পাঠকে আবৃত্তির মাধ্যমে শিল্প পর্যায়ে রূপান্তর;
- শিক্ষককে যথাযথ আবৃত্তি করতে জানতে হবে, ভাষা শিক্ষাদানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ সরব পাঠ দেবেন। শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ করাবেন, শিক্ষার্থীদের ভুল ত্রুটি হলে সহানুভূতির সঙ্গে সংশোধন করে দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি শোনাতে হবে। এর জন্য আবৃত্তির বিভিন্ন শিল্পী বিদ্যালয়ে আনা যেতে পারে, রেকর্ড বাজিয়েও শিক্ষার্থীদের ভালো আবৃত্তি শোনানো যেতে পারে।

২. নীরব পাঠ

বাগযন্ত্র ব্যবহার না করে অর্থাৎ শব্দ না করে মনে মনে পড়াকে নীরব পাঠ বলে। নীরব পাঠের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ শর্ত রয়েছে। যেমন-

- নীরব পাঠে মনোসংযোগ ও একাগ্রতা থাকতে হবে;
- পাঠ নীরবে হলেও শব্দ, ধ্বনি ও যতি চিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে;
- অনাবশ্যক দ্রুত পাঠ করা যাবে না;
- নীরব পাঠের মধ্যদিয়েও লেখকের আবেগ, অনুভূতি, প্রভৃতি উপলব্ধি করতে হবে।

নীরব পাঠে শিক্ষার্থীদের সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগে এবং শক্তিও কম ব্যয় হয়। তাই শিক্ষার্থীদের পক্ষে মনোসংযোগ বজায় রেখে একটানা অনেক সময় নীরব পাঠ করা সম্ভব। শ্রেণিতে নীরব পাঠ অত্যন্ত কার্যকর। কারণ নীরব পাঠে শ্রেণিতে কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় না। লাইব্রেরিতেও অনেক শিক্ষার্থী একসঙ্গে নীরব পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে। নীরব পাঠ মননশীলতার উপযোগী। চিন্তাশীল বিষয়, গবেষণা, মৌলিক চিন্তা ও ভাবগম্ভীর বিষয়ের অধ্যয়নে নীরব পাঠ অপরিহার্য। উচ্চস্তরের শ্রেণিতে অধ্যয়নের জন্য নীরব পাঠ একান্ত প্রয়োজন।

তবে নীরব পাঠের কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন- নীরব পাঠ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শব্দ ও বর্ণের উচ্চারণে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে না। কবিতার ক্ষেত্রে নীরব পাঠ অপেক্ষাকৃত কমকার্যকর। কারণ নীরব পাঠে ছন্দ ও যতি চিহ্নের সঠিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না।

আদর্শ নীরব পাঠে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

শ্রেণিকক্ষে আদর্শ নীরব পাঠে শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন-

- নীরব পাঠে শিক্ষার্থীরা পড়ছে কি না তা শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করা;
- নীরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু কতটা আয়ত্ত করতে পারলো তা মূল্যায়ন করা;
- শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠের প্রতি মনোযোগী থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা।

আদর্শ পাঠের বিশেষত্ব

সব ধরনের পাঠ আদর্শ পাঠ না-ও হতে পারে। অর্থাৎ পাঠকে আদর্শ কিংবা অধিক কার্যকর করতে হলে কতগুলো বিশেষত্ব অর্জন করতে হয়। এই বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বগুলোর ওপর দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে ভাষাশিক্ষা সফল ও সার্থক হবে না।। সরবে কিংবা নীরবে আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বগুলো নিম্নরূপ-

১. নির্ভুলতা

সঠিক ও নির্ভুলভাবে পাঠ করা আদর্শ পাঠের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রচনাটি সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে পড়তে হবে। সরব পাঠের ক্ষেত্রে শান্ত, ছন্দোময়, স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়তে হবে। নীরব পাঠের বেলায়ও সতর্কভাবে মূল রচনাকে অনুসরণ করে সঠিকভাবে পড়তে হবে। নির্ভুলভাবে পড়তে না পারলে রচনার অর্থ উপলব্ধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

২. গতি

পাঠের একটা স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে হবে। সরবে কিংবা নীরবে অনাবশ্যক দ্রুত অথবা ধীরে পাঠ পরিহার করতে হবে। পাঠের গতি শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণি ও মানসিকতা অনুযায়ী দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে। আবার সরব পাঠের ক্ষেত্রে কাব্য ও সাহিত্যের বিষয় পড়ার গতির ওপর তার রস আস্বাদন ও অভিব্যক্তি নির্ভরশীল।

৩. উপলব্ধি

পড়ে বুঝতে পারা ও উপলব্ধি করা আদর্শ পাঠের প্রধান শর্ত। পড়ে বিষয়বস্তু উপলব্ধি ও আয়ত্ত করতে না পারলে আসলে পড়াই হয় না। রচনার বিষয়বস্তু আয়ত্তকরণ, সাহিত্যগুণ, ধ্বনি ও রস, সৌন্দর্যচেতনা প্রভৃতি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে হবে। রচনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলে আদর্শ পাঠ ব্যাহত হয়।

৪. অভিব্যক্তি

রচনা পড়ার পর বিষয়বস্তু আয়ত্তীকরণ এবং উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ হলো অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তি আদর্শ পাঠের একটি অন্যতম শর্ত। সরব অথবা নীরব যে পাঠই হোক না কেন পাঠের বিষয়বস্তুর ওপর অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে আদর্শ পাঠ হয় না।

পাঠের গুরুত্ব

শিশুর কার্যকর সাক্ষরতা অর্জনে পঠনকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। কেননা ভাষার এই দক্ষতাটির নিয়মতান্ত্রিক, কার্যকর এবং ক্রমাগত চর্চা শিশুর অন্যান্য জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে এবং পঠন-দক্ষতা অর্জনেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।। পঠন কেবল শিশুর মাতৃভাষা চর্চার জন্যই অপরিহার্য নয়, বরং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান আহরণ এবং শিক্ষাজীবনের চলমানতার জন্য এটি অপরিহার্য। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পঠন দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়-প্রথম পর্যায়ে শিশু পড়তে শেখে অর্থাৎ পঠনের জন্য শিখন; দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু তার অর্জিত দক্ষতা ব্যবহার করে বিষয়জ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ শিখনের জন্য পঠন। প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হতে পারাটাই হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুর জন্য শ্রেষ্ঠ অর্জন। নিম্নে পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হলো -

- পঠন-দক্ষতা শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে এবং শিশুর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করে;

- পঠন-দক্ষতা শিশুকে বই পড়তে এবং পাঠাভ্যাস গঠনে সহায়তা করে;
- পঠন শিশুকে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে আগ্রহী করে এবং স্বশিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে;
- আনন্দের সাথে পাঠ করলে তথ্য অর্জনের পাশাপাশি যথেষ্ট বিনোদনও লাভ করা যায়। এই বিনোদন শিশুর জ্ঞানস্পৃহাকে বাড়িয়ে দেয়;
- শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো পঠন;
- পঠনের মাধ্যমে শিশু বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য আহরণ করে;
- মনীষীদের জীবনী পঠন ও অন্যান্য বিষয় পঠনের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ, নান্দনিকতা, পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে শিশু পরিচিত হয় এবং এই জ্ঞান ও উপলব্ধি তার মানসিক বৃদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে;
- পঠন শিশুকে সামাজিক, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা করে;
- শিশুর সব বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন নিরূপণে পঠন-দক্ষতা একটি কার্যকর মাপকাঠি;
- উচ্চারণে শুদ্ধতা অর্জনের জন্য পঠন গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম;
- পঠন শিশুর ভাষাদক্ষতা অর্জনের অন্যতম কার্যকর উপায়।

পঠন-দক্ষতা অর্জন

পঠন-দক্ষতা অর্জন শিশুর জন্য অপরিহার্য। শিশুকে দক্ষ পাঠক করার জন্য শিক্ষককে প্রথমেই জানতে হবে শিশু কীভাবে পড়তে শেখে। শিশুর পঠন-দক্ষতা অর্জন ও বিকাশের জন্য শিক্ষক কী কী কার্যকর পন্থা অবলম্বন বা প্রয়োগ করতে পারেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন, যাতে শিশুর পঠন-দক্ষতা অর্জন ও বিকাশে পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে পারেন। কোলের মতে, পঠনে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হয়-১) ভাষাদক্ষতা অর্জন এবং ২) পাঠের মর্মার্থ উপলব্ধি । কোলের এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায় যে, ঐতিহাসিকভাবে পঠনে প্রথাগত ধারণা ব্যবহৃত হলেও সাম্প্রতিককালে সাক্ষরতার ধারণা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

পঠন শিখনের প্রথাগত ধারণা

প্রথাগত পদ্ধতিতে শিশুর পঠন শিখনের জন্য দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ১) ধ্বনি থেকে বাক্য বা Bottom-Up এবং ২) বাক্য থেকে ধ্বনি Top-Down

ধ্বনি থেকে বাক্য পদ্ধতিতে শিশু প্রথমে কোনো ভাষার (সাধারণত মাতৃভাষা) পুরো বর্ণমালা এবং এর উচ্চারণগত দিকটি আয়ত্ত করে। তারপর বর্ণের সমন্বয়ে শব্দ গঠন করতে শেখে। সবশেষে একাধিক শব্দ দিয়ে কীভাবে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশ গঠিত হয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

ধ্বনি থেকে বাক্য পদ্ধতিতে শিশু যে একটি সমৃদ্ধ মৌখিক ভাষার ভাণ্ডার নিয়ে স্কুলে আসে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এই পঠন শিখন-প্রক্রিয়ায় পঠনসামগ্রীতে ব্যবহৃত বিশেষ শৈলী বা রীতি, শব্দের অর্থ, প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা, উচ্চারণের শুদ্ধতা ইত্যাদি শেখানোর ওপরে অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়। ফলে পঠনের আসল উদ্দেশ্য- বিষয়বস্তুর মর্মার্থ উপলব্ধি করা, তা শিশু করতে অসমর্থ হয়।

পঠনসামগ্রীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ কিংবা মর্মার্থ উপলব্ধিতে শিশুর সক্রিয় ভূমিকাকে উপেক্ষা করে বলে গবেষকগণ পঠনের এই পদ্ধতিকে একটি পরোক্ষ প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

গুডম্যান মনে করেন যে, কেবল ভাষার ক্ষেত্রে পঠন শিখন-প্রক্রিয়ায় পঠনসামগ্রীতে ব্যবহৃত বিশেষ শৈলী বা রীতি, শব্দের অর্থ, প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা, উচ্চারণের শুদ্ধতার মাধ্যমে শিশুর কার্যকর পঠন-দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। তিনি Bottom-Upএর বিকল্পে Top-Downপদ্ধতির অবতারণা করেন। এই পঠন-পদ্ধতিতে শিশুকে পঠনসামগ্রীর অর্থ অনুমান করতে, তথ্যপ্রক্রিয়া বুঝতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ Top-Down পদ্ধতিতে শিশুর পূর্বধারণা, অভিজ্ঞতা, ভাষাদক্ষতা ইত্যাদির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিশু প্রতিটি শব্দের প্রতীক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে পঠনসামগ্রী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করে। যদিও এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো পঠনসামগ্রীর অর্থ অনুধাবন, তবে বারবার পড়ার মাধ্যমে শিশু বর্ণ, শব্দ, শব্দের ব্যবহার, বাক্য তৈরি ইত্যাদি প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়। যেহেতু শিক্ষার্থীরা অর্থপূর্ণ বই পড়ে পড়তে শেখে, সেহেতু পড়াটা খুবই উপভোগ করে।

Bottom-Up পদ্ধতি শিশুর ভাষাদক্ষতায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে বলে পঠনসামগ্রী থেকে মর্মার্থ উপলব্ধির প্রসঙ্গটি অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে। এখানে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগও অপেক্ষাকৃত সীমিত। অন্যদিকে Top-Down শিশুর ভাষাদক্ষতার বিকাশের তুলনায় অর্থ অনুসন্ধানের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের ফলে কার্যকর ভাষাদক্ষতা বিকাশে সব সময় সহায়ক হয় না। একারণে শিক্ষাক্রম সাধারণত এ দুটি পদ্ধতির একটি মিশ্রিত রূপ (Blended Method) প্রয়োগ করা হয়। মিশ্র পদ্ধতিতে পঠনসামগ্রীর বৈশিষ্ট্য, শিশুর চাহিদা, যোগ্যতা, ভাষাদক্ষতা এবং পঠনের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে Top-Down এবং Bottom-Up উভয় পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। শিশুদের জন্য পঠনসামগ্রী অর্থবহ হওয়া একান্ত দরকার। কারণ শিশুরা ভাষার অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা অর্জন করে একটি অর্থপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতের মাধ্যমে। তবে এটাও সত্য যে, লিখিত ভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য, অনেক ধরনের বই পড়ার জন্য তাদেরকে বর্ণ চিনতে হবে, শব্দ ও বানানের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, বাক্যের লিখিত রূপ দিতে পারতে হবে। এইজন্য এই দুটি পদ্ধতির মিশ্রিত রূপ প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পঠনের উপাদান ৫টি। যথা: ১। ধ্বনি সচেতনতা ২। বর্ণজ্ঞান ৩। শব্দজ্ঞান ৪। পঠনসাবলীলতা ৫। বোধগম্যতা। এই পাঁচটি উপাদান যথাযথভাবে আয়ত্তের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সাবলীল ও স্বাধীন পাঠক হয়ে ওঠে।

ভাষাদক্ষতা: লেখা

লেখা কী?

লেখা ভাষার একটি স্থায়ী রূপ। বিশ্বের প্রতিটি ভাষারই লেখ্যরূপ রয়েছে। মানুষ লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে এবং যোগাযোগ করে থাকে। লিখিত বক্তব্য লেখকের অনুপস্থিতিতেও পড়ার সুযোগ থাকে। গুনগতমানসম্পন্ন লেখা হলে পড়েন অসংখ্য পাঠক এবং লেখাটিও দীর্ঘদিন টিকে থাকে। লেখার ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার রয়েছে। যেমন: কেউ লেখেন কবিতা, কেউ চিঠি, আবার কেউ কেউ লেখেন গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি। লেখার মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। লেখার সময় খুব মনোযোগী হতে হয়। কেননা লিখতে গেলে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে লিখতে হয়। লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উপযোগিতা হলো- এর মাধ্যমে মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যারা লিখতে পারেন বা লেখেন তারা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হন।

লেখার বৈশিষ্ট্য

১. লেখা ভাষার স্থায়ী রূপ;

২. লেখা উৎপাদনমূলক ভাষিক দক্ষতা;

৩. এটি একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া;

৪. লেখার সময় মানুষ সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হয়।

লেখার গুরুত্ব

লেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এটি ভাষার একটি স্থায়ী রূপ। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে লেখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আগে লেখাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হত। লেখা দলিল-দস্তাবেজ এর ক্ষেত্রে লেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদেরকে অনেক তথ্য এবং প্রয়োজনীয় বিষয় লিখে রাখার প্রয়োজন হয়। আমরা সবসময় সব কথা বা তথ্য মনে রাখতে পারি না। সেসব ক্ষেত্রেও ঐ তথ্যগুলো আমাদের লিখে রাখার প্রয়োজন হয়। সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি ধরে রাখার ক্ষেত্রে লেখার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিখিত বই-পুস্তক পড়ে আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং লেখা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে লেখা অত্যন্ত কার্যকর। সংবাদপত্রে সংবাদ লিখে তা দেশবাসীকে জানানো যেতে পারে। লেখার মাধ্যমে লেখকদেরও আত্মপরিচয় ঘটে এবং লেখার মাধ্যমে তাঁরা অমরত্ব লাভ করতে পারেন। লেখক অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর লেখার মাধ্যমে মানুষ লেখক সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাঁর লিখিত বিষয়াবলি পড়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

লেখার কাজে আমাদের যে প্রত্যঙ্গগুলো জড়িত তা হচ্ছে চোখ, হাত ও আঙুল। এর পশ্চাতে কাজ করছে আমাদের মানস ও ইচ্ছাশক্তি। তাই লেখায় মানসিক তৎপরতা ও স্পর্শানুভূতি একই সঙ্গে কাজ করে। এর ফলস্বরূপ লেখায় ব্যক্তি ও সমাজ-মানসের বিশিষ্ট রূপ প্রতিফলিত হয়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে লিখন-কলা মানস সম্পদ সংরক্ষণে সর্বজনীন ও সহজসাধ্য বাহন রূপে পরিগণিত। কথার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হলেও তা সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ করা সহজসাধ্য নয়। লেখার মাধ্যমেই স্থান ও কালের সীমা ছাড়িয়ে মনন ও চিন্তনের বিস্তার ও রক্ষণ সম্ভব হয়ে থাকে।

লিখন হলো বিভিন্ন কালের যোগসূত্র রক্ষার সর্বোত্তম মাধ্যম। আমরা বর্তমান জীবনের হলেও অতীত আমাদের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতের মধ্যে নিহিত রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এই তিন কালের যোগসূত্র ছাড়া উন্নত জীবনযাপন সম্ভব হতে পারে না। লিখনের মাধ্যমেই এই তিন কালের সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়।

লেখা ভাষা শেখার অন্যতম প্রধান সূত্র। লিখন-নৈপুণ্য অর্জনের মধ্য দিয়েই ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার সম্ভব হয়। ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার ব্যতিরেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ঘটে না। কাজেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য লিখন-নৈপুণ্য অর্জনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

লিখনের প্রথাগত ধারণা

লেখা শেখার প্রচেষ্টা শুধুমাত্র কাগজে-কলমে গড়ে ওঠে না। এটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত ধারাবাহিক ও সহায়তা নির্ভর প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রচলিত ধারণায় মনে করা হয়, যেহেতু শিশুদের লেখার অভিজ্ঞতা কম, তাই তারা স্বাধীনভাবে লিখতে পারে না। এর অর্থ এই যে, যখন শিশুরা প্রথম লিখতে শেখে তখন তাদের বড়দের লেখা অনুসরণ করে লেখা উচিত। এক্ষেত্রে সঠিক বানান ও সঠিক আকার-আকৃতিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে মনে করেন। কারণ হিসেবে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চান,

যেভাবে শিশুরা কোনো কিছু দেখে অথবা যেভাবে তাকে লিখতে বলা হয়েছে সেটিই তার লেখার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেই লেখার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

লিখনের আধুনিক ধারণা

শিশুদের প্রাথমিক লিখন-প্রক্রিয়া বিদ্যালয়ে আসার অনেক আগে থেকেই শুরু হয় এবং শিশুরা এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। শিশুদের অধিকাংশই জানে যে, লেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে বিন্যস্ত হয় এবং উপর দিক থেকে নিচের দিকে বিস্তৃত হয়। শিশুদের অনেকেই বর্ণের আকৃতি জানে, প্রতীক চেনে, এমনকি বর্ণ যুক্ত করলেই যে শব্দ হয় না এটিও তারা জানে। এর কারণ হলো, তার চারপাশে যে সকল লেখা দেখে সেখান থেকেই সে ধারণা পায়, যা দেখে তা অনুকরণ করে, বিষয়গুলোকে প্রকাশ করে এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য ও কোনটি গ্রহণযোগ্য নয় তা আবিষ্কারের চেষ্টা করে।

লেখার সুবিধাসমূহ :

- শিক্ষার্থীরা নিজেরাই লেখার মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়।
- নিজেরাই লেখার প্রায়োগিক দক্ষতায় সিদ্ধ হয়।
- ভুল থেকেই শিক্ষার্থীরা সুযোগকে গ্রহণ করে।
- নিজেদের জ্ঞান ও তথ্যের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করে।
- সঠিকভাবে বর্ণ লেখা, বানান ঠিক করা বা হাতের লেখা পরিচ্ছন্নতা করার ওপর বিশেষ তাগিদ থাকে না বলে শিক্ষার্থীরা শিখনে স্বাধীনভাবে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে।
- লেখা শিশুকে চিন্তা-কল্পনা-প্রবণ ও সৃজনশীল হতে সহায়তা করে এবং লেখার মাধ্যমে শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে ।
- শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই শিক্ষার্থীকে লেখা চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য অর্জনে প্রেষণা সৃষ্টি করে।
- দ্রুত লেখার ক্ষেত্রে হয়তো শিক্ষার্থী একটু পিছিয়ে। এর জন্য তাকে সময় দিতে হবে। তাকে ধারণা দিতে হবে যে, লেখা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। নিজেকেই লেখার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুকে তার লক্ষ্যে যেতে দিতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে সে লেখার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আবিষ্কারের সুযোগ পাবে।

লিখন শিখনে শিক্ষকের করণীয়

- লেখার বিষয়ে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল করে না তোলা;
- পঠনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া।

লেখার দক্ষতা উন্নয়নের কৌশল

ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বর্ণ, শব্দ ও বাক্য লেখাই একটি শিশুর জন্য সব নয়। শিশুর লেখার উপর ধারাবাহিক উন্নয়ন তাকে লেখার জগতে একটি অত্যুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে। এর জন্য প্রয়োজন লেখার দক্ষতা উন্নয়নের ধারাবাহিক কার্যক্রমের নিরন্তর অনুশীলন। লেখার দক্ষতা উন্নয়নের এই কৌশল ভাষার দক্ষতা মূল্যায়নের সমতুল্য হলেও এটি একটি কৌশলও বটে। এ কৌশল মূলত তিনভাবে বিন্যস্ত যথা: ১। নিয়ন্ত্রিত লিখন ২। নির্দেশিত লিখন ও ৩। মুক্ত লিখন

১. নিয়ন্ত্রিত লিখন

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ লেখাটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন: একটি শব্দ বা বাক্য লিখতে দিয়ে তা অনুশীলন করানো, কতকগুলো নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া, কতকগুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য জানার জন্য কতকগুলো প্রশ্নোত্তর লিখতে দেওয়া, এলোমেলো শব্দ/ বাক্য সাজিয়ে লিখতে দেওয়া, হাতের লেখা ইত্যাদি। এটা বর্ণের গঠন, শব্দ ও বাক্যের কাঠামো ও বানানের শুদ্ধতা আনয়নে সহায়তা করে।

২. নির্দেশিত লিখন

এরূপ লিখনে শিক্ষার্থীকে কিছু সূত্র দিয়ে দেওয়া হয়- যেন সে সূত্র ধরে কিছু লিখতে পারে। যেমন: বাক্য সম্পূর্ণকরণ, ছবি দেখে বর্ণনা করা, নির্দিষ্ট বাক্যকাঠামো ব্যবহার করে অনেকগুলো বাক্য তৈরি করা, কোনো প্রশ্ন ঘুরিয়ে করা ইত্যাদি। এরূপ লিখনের সাহায্যে সাধারণত কিছু তথ্য সরবরাহ করা হয়। কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয় বিধায় এরূপ লিখনকে নির্দেশিত লিখন বলে।

৩. মুক্ত লিখন

কোনো একটি বিষয় বা বস্তুর উপর শিক্ষার্থী নিজের মতো করে মনের ভাব গুছিয়ে লিখবে। শিক্ষক শুধু লেখার সূত্র ধরে দেবেন, কীসের উপর লেখা। এতে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশ লাভ করে। অনুচ্ছেদ লিখন, চিঠি লিখন, গল্প লিখন, রচনা লিখন, কোনো কিছুর বর্ণনা, ব্যাখ্যাকরণ, তুলনাকরণ, বিশ্লেষণকরণ ইত্যাদি এরূপ লেখার উদাহরণ

অধ্যায় ৩

বাংলা ভাষার উপাদান

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে বাংলা, আবার বাংলা একটি পাঠ্যবিষয়ও বটে। বিষয় হিসেবে পঠিত বাংলার প্রধান লক্ষ্য ভাষাদক্ষতা (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) অর্জন ও উন্নয়ন। শিক্ষাক্রমে বাংলা ভাষার প্রমিত রীতি আয়ত্ত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রমিত উচ্চারণরীতি নিশ্চিতকরণে বাংলা ধ্বনিসমূহের প্রকৃত উচ্চারণ আয়ত্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ অপরিহার্য। কোনো ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে সে ভাষার উপাদান – ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, বাক্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য। এ অধ্যায়ে বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের পরিচয় ও উচ্চারণরীত, যুক্তবর্ণ ও তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্য এবং বাংলা ভাষার শব্দ, বাক্য ও বিরামচিহ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভাষার ধ্বনি উচ্চারণে বাক্‌প্রত্যঙ্গ

পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মানুষের নিকট বাগধ্বনি-নির্ভর ভাষাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। যে-কোনো ভাষার বাগধ্বনি সৃষ্টির জন্য দেহের একটি বিশেষ স্থানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো কোনোটির পরিচালনা প্রয়োজন হয়। এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকেই আমরা বাক্প্রত্যঙ্গ বলে থাকি। ধ্বনি গঠনে বাক্প্রত্যঙ্গগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর ভূমিকা দুই রকম হতে পারে। প্রথমত, এগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনি গঠিত হয়; দ্বিতীয়ত, এগুলোর সাহায্যে ধ্বনির প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

ধ্বনি গঠনের ক্ষেত্রে কিছু বাক্প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে আর কিছু প্রত্যঙ্গ পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। নিচে মানুষের বাগধ্বনি উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলোর পরিচয় দেওয়া হলো।

ফুসফুস

আমরা জানি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়তা করা এবং রক্তশোধন করা ফুসফুসের প্রধান কাজ। তবু ফুসফুসই শেষ পর্যন্ত মানুষের বাগধ্বনি উৎপাদনের কেন্দ্র। প্রাণধারণের জন্যে মানুষ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করে এবং ত্যাগ করে। শ্বাসবায়ুর বর্হিগমনকালে গলনালি ও মুখবিবরের বিভিন্ন অংশে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এ সংঘর্ষের স্থান, রূপ ও পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন ধ্বনি উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগধ্বনি।

স্বরযন্ত্র

ধ্বনির উৎপত্তি ও শ্রুতির দিক থেকে বাক্প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে ফুসফুসের পরে স্বরযন্ত্রের (larynx) মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীর (vocal cords) স্থান। মানুষের গলার সামনের দিকের যে অংশটি উঁচু হয়ে থাকে তাকে ইংরেজিতে বলা হয় Adam's Apple। এর মধ্যে রয়েছে কোমলাস্থি ও উল্টো 'ভি (^) আকৃতির দুটো সূক্ষ্ম তন্ত্রী। তন্ত্রী দুটোর নাম স্বরতন্ত্রী বা vocal cords। স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথকে বলা হয় glottis। ফুসফুস তাড়িত বাতাস যখন স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ দিয়ে বেরিয়ে যায় তখন তন্ত্রীদ্বয় কখনো কাঁপে আবার কখনো কাঁপে না। glottis-এর রূপ বাগধ্বনির প্রকৃতি ও গুণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরতন্ত্রীদ্বয় কম্পিত হয় তাদের বলে ঘোষ ধ্বনি এবং যেসব ধ্বনি উচ্চারণে কম্পিত হয় না তাদের বলে অঘোষ ধ্বনি।

নাসিকাগহ্বর

গলকক্ষের ওপরে আলজিহ্বার অব্যবহিত পেছনেই নাসিকা গহ্বর। নাসিকা গহ্বর বাংলা ছাড়াও পৃথিবীর বহু ভাষার ধ্বনি উৎপাদনে সহায়তা করে। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপাদনে আলজিহ্বাসহ কোমল তালু কিছুটা ঝুলে পড়ে বলে সংশ্লিষ্ট বাতাস মুখবিবর দিয়ে বের না হয়ে নাসাপথে বের হয়। আর আনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে বাতাস উভয় পথে বের হয় বলে তারা মুখ ও নাকের দ্যোতনা লাভ করে।

মুখবিবর

মুখবিবরের মধ্যেই অধিকাংশ ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এখানেই রয়েছে ধ্বনি উচ্চারণের সবচেয়ে কার্যকর বাকপ্রত্যঙ্গগুলো – জিহ্বা, তালু, দাঁত ইত্যাদি।

মুখের উপরিভাগে বাইরের দিক থেকে প্রথমেই আসে ওপরের ঠোঁট। ওপরের ঠোঁটের পেছনেই ওপর-পাটি দাঁত। এরপর দন্তমূল। দাঁত ও তালুর মাঝখানে উত্তল অংশই দন্তমূল। সূক্ষ্ম ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারের জন্যে দন্তমূলকে আবার অগ্রদন্তমূল, দন্তমূল, পশ্চাৎদন্তমূল বা অগ্রতালু ইত্যাদি অংশে ভাগ করা হয়।

উত্তল দন্তমূলের পরের ধনুকাকৃতি অবতল অংশ ওপরের তালু। ওপরের তালুকে শক্ত তালু ও কোমল তালু – এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। দন্তমূলের শেষাংশ থেকে ভেতরের দিকে যেতে অস্থিময় অংশ যেখানে শেষ হয়েছে সেটুকুর নাম শক্ত তালু। তালুর অস্থিময় অংশ শেষ হবার পরই শুরু হয় মাংসল অংশ। তালুর অস্থি-প্রধান অংশের শেষ থেকে আলজিহ্বা পর্যন্ত প্রসৃত অংশের সবটুকুই কোমল তালুর অংশীভূত। এক পশ্চাত্তালুও বলা হয়। পশ্চাত্তালুর গঠন মাংসল বলে শ্বাসবায়ুর চাপে তা কিছুটা ওঠানামা করে। এ কারণে নমনীয় পশ্চাত্তালু বাগধ্বনির গঠন-প্রকৃতিতে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

মুখবিবরের নিচের ভাগের প্রথমেই অধর বা নিচের ঠোঁট। তারপর নিচের পাটি দাঁত।

জিহ্বা বাক্‌প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় প্রত্যঙ্গ। সূক্ষ্ম ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারের জন্যে জিহ্বাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে। নিচের পাটি দাঁতের পরেই জিহ্বার অগ্রভাগ বা মুখগহ্বরের সবচেয়ে বেশি নমনশীল অংশ জিভের ডগা।

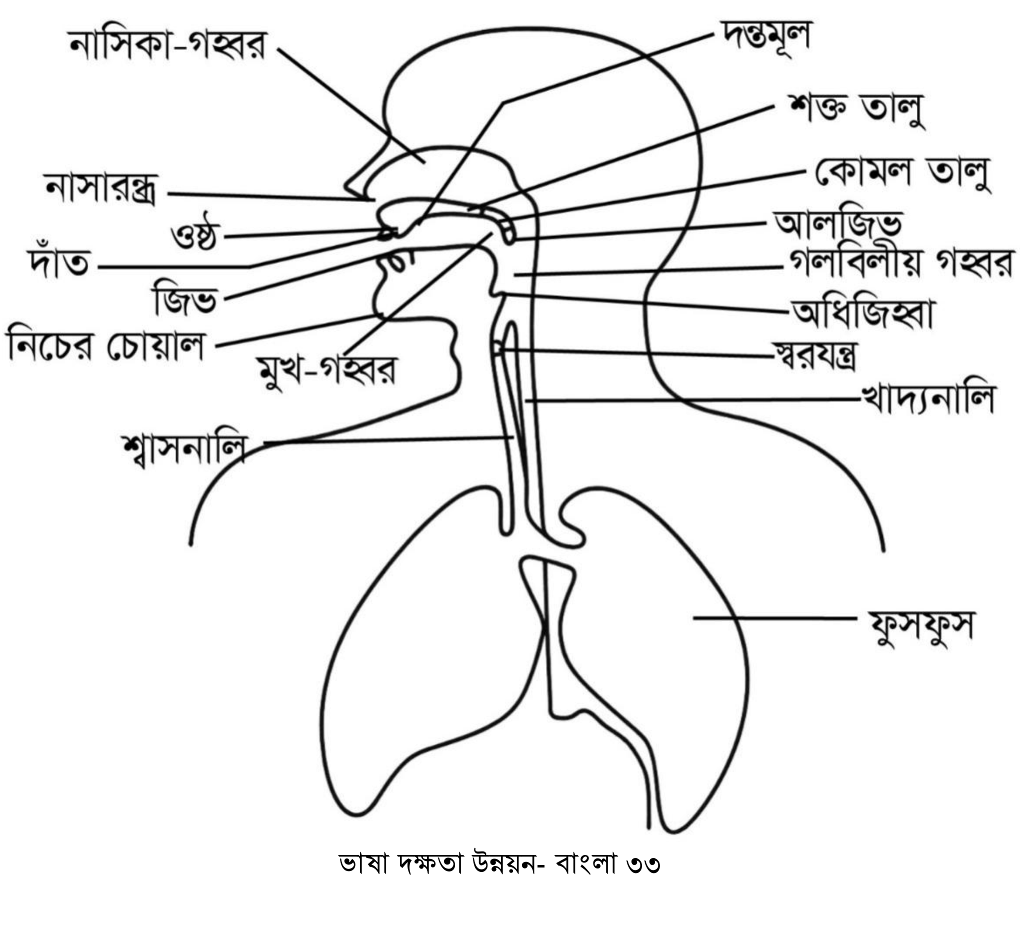

চিত্র : মানব বাকপ্রত্যঙ্গ

জিভের ডগা সংলগ্ন আধ ইঞ্চি পরিমাণ পেছনের অংশ জিভের পাতা। জিভের পাতার শেষাংশ থেকে ভেতরের দিকের মূর্ধা বরাবর অংশটি জিহ্বাগ্র। মূর্ধার সীমানা থেকে পশ্চাত্তালু ও আলজিহ্বার সংযোগস্থলের সীমানা বরাবর জিহ্বার এ অংশটি পশ্চাৎ জিহ্বা। একেও পশ্চাৎ জিহ্বার সম্মুখ ও পশ্চাৎ জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তারপর আর একটু ভেতরের দিকে জিহ্বামূল। জিহ্বামূলের সঙ্গেই বায়ুনালীর মুখাবরক Epiglottis বা অধিজিহ্বার স্থান।

বাক্প্রত্যঙ্গগুলো ফুসফুস-তাড়িত বায়ুকে বিচিত্রভাবে বাধা দিয়ে বা চাপা খাইয়ে বা বায়ুপথের রূপ পরিবর্তন করে বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করে। যে-কোনো একটি ধ্বনি উচ্চারণে নির্দিষ্ট দুটো বাক্প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন হয় – এদের ধ্বনিটির উচ্চারক (Articulator) বলে।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো উচ্চারণে কোন কোন বাক্প্রত্যঙ্গ ভূমিকা পালন করে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

১. দুই ঠোঁট বন্ধ করে বা নিচের ঠোঁট ওপরের ঠোঁটের দিকে উঁচু করার ফলে বায়ুপথের সংকীর্ণতাজনিত যে ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলোকে বলা হয় ওষ্ঠ্যধ্বনি। উদাহরণ – প ফ ব ভ ম।
২. জিহ্বার ডগা ওপরের পাটি দাঁতের গোড়া স্পর্শ করার জন্য যেসব ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো দন্তমূলীয় ধ্বনি। উদাহরণ– ন র ল।
৩. জিহ্বার ডগা সামান্য উল্টে গিয়ে দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে যেসব ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাদের দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলে। উদাহরণ – ট ঠ ড ঢ ড় ঢ়।
৪. জিহ্বার পাতা দন্তমূল স্পর্শ করলে পশ্চাৎ দন্তমূলীয় শ উচ্চারিত হয়।
৫. জিহ্বার পাতা ও সামনের অংশ অগ্রতালুকে চেপ্টাভাবে স্পর্শ করলে পাওয়া যায় প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি। উদাহরণ – চ ছ জ ঝ।
৬. পশ্চাৎ জিহ্বা কোমল তালুকে স্পর্শ করলে উচ্চারিত হয় পশ্চাত্তালুজাত বা কোমলতালুজাত ধ্বনি। উদাহরণ – ক খ গ ঘ ঙ।
৭. স্বরযন্ত্রে মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রী দুটো পরস্পর স্পর্শ করে বাংলার হ, ঃ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এদের নাম আন্তঃস্বরতন্ত্রীজাত বা কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি।

ওপরে যে বাক্প্রত্যঙ্গগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে পৃথিবীর কোনো না কোনো ভাষার ধ্বনি উচ্চারণে তার সবগুলোই ব্যবহৃত হয়। ভাষার ধ্বনি গঠনে পৃথিবীব্যাপী এ সার্বজনীনতাটুকু লক্ষ করা যায়। কিন্তু যে কোনো একটি ভাষার ধ্বনি উচ্চারণে নির্দিষ্ট কয়েকটি বাক্প্রত্যঙ্গই ব্যবহৃত হয়, সবগুলোর প্রয়োজন হয় না।

বাংলা ভাষার স্বরধ্বনিসমূহ

কোনো ভাষার ধ্বনিমালার মধ্যে প্রধানত দুই শ্রেণির ধ্বনি বিদ্যমান। এগুলো হলো – স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বরধ্বনিগুলো বাগধ্বনিসমূহের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না বা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি। এগুলো অন্য কোনো ধ্বনির সহায়তা ছাড়াই নিজে উচ্চারিত হতে পারে।

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ আছে এগারোটি। এগুলো হলো– অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ। এই এগারোটি স্বরবর্ণ থাকলেও আমরা বর্তমানে সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি। এগুলো হলো: ই এ অ্যা আ অ ও উ। বাংলা ভাষার প্রমিত উচ্চারণরীতি আয়ত্ত করতে হলে এই মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর প্রকৃত উচ্চারণ আয়ত্ত করতে হবে।

আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে স্বরধ্বনিগুলোর বিচারে তিনটি মাপকাঠি ব্যবহৃত হয় –

ক. স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার কোন অংশ উঁচু হয়, তা খুঁজে বের করা;

খ. জিহ্বা কতটুকু উঁচু হয় তার পরিমাণ জানা;

গ. স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থা জানা।

এই মাপকাঠি অবলম্বনে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করো হলো।

ক. স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার কোন অংশ উঁচু হয়– এই বিবেচনায় বাংলা স্বরধ্বনিগুলোকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয় :

১. সম্মুখ স্বরধ্বনি
২. পশ্চাৎ স্বরধ্বনি

যেসব ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার সামনের অংশ তালুর দিকে উঁচু হয়, তাদেরকে সম্মুখ স্বরধ্বনি বলে। ই, এ, এ্যা – এ তিনটিসম্মুখ স্বরধ্বনি।

যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার পশ্চাৎ অংশ উঁচু হয়, তাদেরকে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলে। অ, ও, উ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। আ-কে অনেকেই কেন্দ্রীয় বা মধ্য স্বরধ্বনি বলে থাকেন, তবে আ-য়ের উচ্চারণে জিহ্বার টান পশ্চাতের দিকে বেশি থাকায় একে পশ্চাৎ স্বরধ্বনির পর্যায়ে ফেলা যায়।

খ. স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার যে অংশ উঁচু হয়, তার পরিমাপের ভিত্তিতে বাংলা স্বরধ্বনিগুলো চার শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. উচ্চ স্বরধ্বনি

২. উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি

৩. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি

৪. নিম্ন স্বরধ্বনি

যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা সবচেয়ে বেশি উঁচু হয়, তাকে উচ্চ স্বরধ্বনি বলে। মুখগহ্বরের সংকীর্ণতার জন্যে এদের সংবৃত স্বরধ্বনিও বলা হয়। ই , উ – স্বরধ্বনিদ্বয় উচ্চ স্বরধ্বনি।

যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা উচ্চ অবস্থান থেকে সামান্য নিচে অবস্থান করে, তাকে উচ্চ-মধ্য বা অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি বলে। এ, ও – স্বরধ্বনি দুটি উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি।

নিম্ন অবস্থান থেকে জিহ্বা সামান্য উঁচুতে উঠে যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে নিম্ন-মধ্য বা অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি বলে। বাংলায় অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি দুটি – অ্যা , অ ।

জিহ্বার সর্বনিম্ন অবস্থানে যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে নিম্ন বা বিবৃত স্বরধ্বনি বলে। আ নিম্ন স্বরধ্বনি।

গ. ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থা বিবেচনায় বাংলা স্বরধ্বনিগুলোকে শ্রেণিকরণ করা যায়।

ঠোঁটের আকৃতি বিবেচনায় স্বরধ্বনিগুলো তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত –

১. প্রসৃত স্বরধ্বনি
২. গোলাকার স্বরধ্বনি
৩. নির্লিপ্ত

স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট প্রসৃত হলে, তাদের প্রসৃত স্বরধ্বনি বলে। ই, এ, অ্যা – ধ্বনি তিনটি প্রসৃত।

অ, ও, উ – ধ্বনি তিনটি গোলাকার, কারণ এদের উচ্চারণে ঠোঁট গোলাকৃতি ধারণ করে। তাই এদের গোলাকার স্বরধ্বনি বলে। আ-কে নির্লিপ্ত বলা যায়। কারণ আ উচ্চারণে ঠোঁট তেমন প্রভাব রাখে না, নির্লিপ্ত থাকে।

চোয়ালের মধ্যবর্তী ফাঁক বিবেচনায় স্বরধ্বনিগুলো চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত –

১. সংবৃত স্বরধ্বনি
২. অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি
৩. অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি
৪. বিবৃত স্বরধ্বনি

যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ সংকীর্ণ থাকে, তাকে সংবৃত স্বরধ্বনি বলে। ই, উ – স্বরধ্বনিদ্বয় সংবৃত।

চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ সংবৃত থেকে ঈষৎ বেশি ফাঁক হয়ে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলোকে অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি বলে। এ, ও অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি।

যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে চোয়ালের মধ্যবর্তী ফাঁক বিবৃত অবস্থা থেকে কিছুটা কম থাকে, তাকে অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি বলে। অ্যা, অ ধ্বনি দুটি অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি।

আ ধ্বনিটি উচ্চারণে চোয়ালের মধ্যবর্তী ফাঁক সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই একে বিবৃত স্বরধ্বনি বলে।

স্বরধ্বনিগুলোর স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচের ছকে দেখানো যায় –

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3">জিহ্বার অবস্থান</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>সম্মুখ</td><td>মধ্য</td><td>পশ্চাৎ</td></tr>
<tr><td rowspan="4">জিহ্বার উচ্চতা</td><td>উচ্চ</td><td>ই</td><td></td><td>উ</td><td>সংবৃত</td><td rowspan="4">চোয়ালের অবস্থা</td></tr>
<tr><td>উচ্চ-মধ্য</td><td>এ</td><td></td><td>ও</td><td>অর্ধ-সংবৃত</td></tr>
<tr><td>নিম্ন-মধ্য</td><td>অ্যা</td><td></td><td>অ</td><td>অর্ধ-বিবৃত</td></tr>
<tr><td>নিম্ন</td><td></td><td>আ</td><td></td><td>বিবৃত</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>প্রসৃত</td><td>নির্লিপ্ত</td><td>গোলাকার</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">ঠোঁটের আকৃতি</td></tr>
</table>

স্বরধ্বনির প্রমিত উচ্চারণরীতি

প্রমিত উচ্চারণরীতিতে বলার দক্ষতা অর্জনে প্রতিটি স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ আলাদা আলাদাভাবে জানা গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি শব্দ-মধ্যে অন্য ধ্বনির সংস্পর্শে যেভাবে উচ্চারিত হয়, তা-ও জানা প্রয়োজন। নিচে স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণবিধি উল্লেখ করা হলো।

অ-ধ্বনির উচ্চারণ

অ-ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার পেছনের অংশ কোমল তালুর দিকে নিম্ন অবস্থা থেকে সামান্য উঁচু হয়। ঠোঁট গোলাকার ও চোয়াল থাকে অর্ধ-বিবৃত। অ-ধ্বনি আবার কিছুটা ও-এর মতো অর্ধ-সংবৃতরূপে উচ্চারিত হতে পারে।

শব্দে অবস্থানভেদে অ-ধ্বনির দুরকমের উচ্চারণ হতে পারে।

ক. অ-ধ্বনির স্বাভাবিক (অর্ধ-বিবৃত) উচ্চারণ

শব্দের আদিতে:

১. শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ'। যেমন - অটল, অনাহার, অনাচার।

২. 'অ' কিংবা 'আ'-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন - অমানিশা, কথা।

শব্দের মধ্যে ও অন্তে:

১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত 'অ'। যেমন - কদম, কত, শ্রেয়।

২. ঋ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি ও ঐ-ধ্বনির পরবর্তী 'অ' প্রায়ই বিবৃত হয়, যেমন - তৃণ, মৌন, ধৈর্য।

৩. অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের 'অ' বিবৃত হয়, যেমন - রচিত, জনিত।

খ. অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ

অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণে চোয়ালের ফাঁক কম ও ঠোঁট গোলাকৃতি হয়ে 'ও'-র মতো উচ্চারিত হয়।

শব্দের আদিতে:

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দে আদি 'অ' সংবৃত হয়। যেমন- অতি (ওতি), করুন (কোরুন), করে (অসমাপিকা 'কোরে')।

২. পরবর্তী ই, উ ইত্যাদির প্রভাবে র-ফলা যুক্ত 'অ' সংবৃত হয়। যেমন- প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর)। কিন্তু অ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন, প্রভাত, প্রলয়।

শব্দের মধ্যে ও অন্তে:

১। তর, তম প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদের অন্ত্য 'অ' সংবৃত হয়। যেমন - (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো)।

২। ই, উ-এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য 'অ' সংবৃত। যেমন, প্রিয় (প্রিয়ো), যাবতীয় (যাবতিয়ো)।

আ-ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (calm) শব্দের 'আ'-এর মতো। যেমন- আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি। বাংলায় একাক্ষর শব্দে 'আ' দীর্ঘ হয়। যেমন- জাম শব্দে 'আ' দীর্ঘ । কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে 'আ'-এর উচ্চারণ হ্রস্ব। যেমন- জামা শব্দে 'আ' হ্রস্ব।

ই ঈ-ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই-ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ-ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ দুটোই দীর্ঘ হয়, কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে হ্রস্ব হয়।। যেমন- দীন (দীর্ঘ)- দীনা (হ্রস্ব), নিচ (দীর্ঘ)- নিচু (হ্রস্ব)। এজন্য ঈ মৌলিক স্বরধ্বনি নয়।

উ ঊ-ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলায় উ এবং ঊ-কারের উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের উ এবং ঊ দুটোই দীর্ঘ হয়, কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে হ্রস্ব হয়।। যেমন- চুল (দীর্ঘ)- চুলা (হ্রস্ব), রূপ (দীর্ঘ)- রূপা (হ্রস্ব)। এজন্য ঊ মৌলিক স্বরধ্বনি নয়।

ঋ-ধ্বনির উচ্চারণ

ঋ বাংলায় মৌলিক স্বর হিসেবে উচ্চারিত হয় না। স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঋ-এর উচ্চারণ রি-এর মত হয়। আর ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র-ফলা + ই-কারের মতো হয়। যেমন- ঋণ, ঋতু (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষি (কৃষি)।

এ/অ্যা-ধ্বনির উচ্চারণ

এ ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত ও বিবৃত উভয়ই হতে পারে। 'দেখি' শব্দে এ-এর প্রকৃত উচ্চারণ সংবৃত। যেমন- দেখি (দেখি)। কিন্তু দেখা (দ্যাখা) শব্দে এ-এর উচ্চারণ বিবৃত। এ-এর বিবৃত (অ্যা) উচ্চারণ কালক্রমে বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিবৃত এ-কে অ্যা দিয়ে লেখা হয়। '্যা' দিয়ে এ বর্ণের কারচিহ্ন লেখা হয়।

এ-এর সংবৃত উচ্চারণ

১. পদের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- পথে, ঘাটে, আসে।

২. তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন- দেশ, প্রেম, শেষ।

৩. একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত। যেমন- কে, সে, যে।

৪. হ কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- দেহ, কেহ, কেষ্ট।

৫. ই বা উ-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- লেখি, বেলুন।

এ ধ্বনির বিবৃত (অ্যা) উচ্চারণ

এ ধ্বনির বিবৃত (অ্যা) উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)-এ 'এ' এর মতো। যেমন, দেখ (দ্যাখ্), এক (এ্যাক) ইত্যাদি। অ্যা/এ্যা-এর উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

১. দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে - যেমন, এত, হেন, কেন।

২. অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগে অ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন- খেংড়া, চেংড়া, গেঁজেল।

৩. খাঁটি বাংলা শব্দে অ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন- খেমটা, ঢেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।

ঐ ধ্বনির উচ্চারণ

ঐ বাংলায় মৌলিক ধ্বনি নয়, একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + ই - এই দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন- বৈধ, বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-ধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ। যেমন- গো, জোর, রোগ, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণত হ্রস্ব। যেমন- রোগা, বোনা, সোনা ইত্যাদি। ও ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)-এর মতো।

ঔ ধ্বনির উচ্চারণ

ঔ বাংলায় মৌলিক ধ্বনি নয়, একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + উ - এই দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এটি যৌগিক স্বরধ্বনির প্রতীক বা চিহ্ন। যেমন- গৌরব, নৌকা, গৌণ।

বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ

যেসব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস তাড়িত বাতাস কোথাও না কোথাও বাধা পায় বা শ্রুতিগ্রাহ্যরূপে চাপা খায়, সেগুলোকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি। এগুলো স্বরধ্বনির সহায়তা ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না।

বাংলা বর্ণমালায় ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি। এই ৩০টি ব্যঞ্জনধ্বনিই আমরা উচ্চারণ করি।

ব্যঞ্জনবর্ণ	মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি	মন্তব্য
ক খ গ ঘ ঙ	ক খ গ ঘ ঙ	
চ ছ জ ঝ ঞ	চ ছ জ ঝ	ঞ -এর উচ্চারণ ন-এর মতো।
ট ঠ ড ঢ ণ	ট ঠ ড ঢ	ণ -এর উচ্চারণ ন-এর মতো।
ত থ দ ধ ন	ত থ দ ধ ন	
প ফ ব ভ ম	প ফ ব ভ ম	
য র ল	র ল	য-এর উচ্চারণ জ-এর মতো।
শ ষ স হ	শ স হ	ষ-এর উচ্চারণ শ-এর মতো।
ড় ঢ় য় ৎ	ড় ঢ়	য় শ্রুতি ধ্বনি, ৎ প্রকৃতপক্ষে ত্
ং ঃ ঁ		ং ও ঙ এবং ঃ ও হ-এর উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন; ঁ আনুনাসিকতার চিহ্ন

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিকরণ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ বিচার-বিশ্লেষণে উচ্চারণস্থান, উচ্চারণরীতি, কোমলতালুর অবস্থা, বায়ুর চাপ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

উচ্চারণ স্থানের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহকে কয়েকটি বর্গে ভাগ করা হয়। যেমন,

১. ক-বর্গীয় ধ্বনি : ক, খ, গ, ঘ, ঙ

জিহ্বামূল এবং কোমল তালুর স্পর্শে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি।

২. চ-বর্গীয় ধ্বনি : চ, ছ, জ, ঝ, ঞ

তালুর সামনের অংশে জিভের পাতার সম্মুখভাগের স্পর্শে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।

৩. ট-বর্গীয় ধ্বনি: ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

জিভটি উল্টে গিয়ে উপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধা স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের নাম মূর্ধন্যধ্বনি।

৪. ত-বর্গীয় ধ্বনি: ত, থ, দ, ধ, ন

জিভের পাতার সম্মুখভাগ উপর পাটি দাঁতের গোড়ার দিকে স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় দন্ত্য ধ্বনি।

৫. প-বর্গীয় ধ্বনি: প, ফ, ব, ভ, ম

ঠোঁট দুটি পরস্পর স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের ওষ্ঠ্যধ্বনি বলা হয়। ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্গে মোট পঁচিশটি ধ্বনি। এসব ধ্বনির উচ্চারণে ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাকপ্রত্যঙ্গের কোথাও কোথাও বাধা পায় এবং স্পৃষ্ট হয় বলে এদের স্পর্শধ্বনি বলা হয়।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রমিত উচ্চারণরীতি

উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে যেমন বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে ৫টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে তেমনি ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিকে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ, অঘোষ, নাসিক্য ইত্যাদি ধ্বনিগুণের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো :

ঘোষ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয় কম্পিত হয়, সেসব ব্যঞ্জনধ্বনিকে ঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ৩য় ধ্বনি (গ জ ড দ ব), ৪র্থ ধ্বনি (ঘ ঝ ঢ ধ ভ) এবং ঙ ন ম র ল ড় ঢ় হ ঘোষ ধ্বনি।

অঘোষ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয় কম্পিত হয় না, সেসব ব্যঞ্জনধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ১ম ধ্বনি (ক চ ট ত প), ২য় ধ্বনি (খ ছ ঠ থ ফ) এবং শ স অঘোষ ধ্বনি।

স্বল্পপ্রাণ বা অল্পপ্রাণ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ুচাপের স্বল্পতা থাকে, ফলে বাতাস আস্তে বের হয় সেসব ধ্বনিকে স্বল্পপ্রাণ বা অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ১ম ধ্বনি (ক চ ট ত প), ৩য় ধ্বনি (গ জ ড দ ব) এবং ঙ ন ম র ল ড় শ স স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ুচাপের আধিক্য থাকে, ফলে বাতাস সজোরে বের হয় সেসব ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ২য় ধ্বনি (খ ছ ঠ থ ফ), ৪র্থ ধ্বনি (ঘ ঝ ঢ ধ ভ) এবং ঢ় হ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুসতাড়িত বাতাস মুখ গহ্বরের কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু পরক্ষণেই কোমল তালু নিচে নেমে এসে নাসিকা গহ্বরের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং বাতাস সম্পূর্ণ নাক দিয়ে বেরিয়ে যায় সেসব ধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ৫ম ধ্বনি পাঁচটি নাসিক্য হলেও তাদের মধ্যে ঙ, ন, ম - এই তিনটিই মৌলিক নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি

যেসব ধ্বনি উচ্চারণে উচ্চারকদ্বয় পরস্পর সংস্পর্শ লাভ করে এবং ফুসফুস-নির্গত বায়ুপ্রবাহকে বাধা দেয়, আটকে রাখে এবং পরক্ষণেই ফটকার মত আওয়াজ করে বাতাস ছেড়ে দেয়, তাদের স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে। বাংলায় স্পৃষ্ট ধ্বনি বিশটি - ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ।

পার্শ্বিক ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার এক পাশ বা দু পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেওয়া হয়, পার্শ্বোত্থিত বা পার্শ্বজাত সেই ধ্বনিকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। ল পার্শ্বিক ধ্বনি।

কম্পনজাত ধ্বনি

জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে ও তদ্দারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, তাকে কম্পনজাত ধ্বনি বলে। র কম্পনজাত ধ্বনি।

তাড়নজাত ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্থাৎ উল্টো পিঠের দ্বারা দন্তমূলে দ্রুত আঘাত করে বায়ুপ্রবাহে একরকম তাড়না সৃষ্টি করা হয়, তাকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। ড় ঢ় - এই ধ্বনি দুটি তাড়নজাত।

উষ্ম বা শিসধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা পায় না, তবে বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় বা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খায় এবং শিস ধ্বনির সৃষ্টি করে, তাকে উষ্ম বা শিসধ্বনি বলে। শ স হ - এই তিনটি শিস বা উষ্ম ধ্বনি।

নিচের ছকে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে বিন্যস্ত করে দেখানো হলো:

উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী শ্রেণি	অঘোষ	ঘোষ

	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ্য/জিহ্বামূলীয়	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম
অন্যান্য	শ স		র ল ড়	ঢ় হ	

বাংলা বর্ণপ্রকরণ ও যুক্তবর্ণ

মুখের ভাষাকে স্থায়ী ও দৃশ্যমান রূপ দিতে ভাষার লেখ্যরীতির উদ্ভব। উচ্চারিত ধ্বনির লেখ্য প্রতীক বর্ণ ব্যবহার করেই লেখ্য ভাষা রূপায়িত হয়। পৃথিবীর অনেক ভাষারই বর্ণমালা রয়েছে। যেমন-বাংলা, ইংরেজি, রুশ, হিন্দি প্রভৃতি। এসব ভাষার লিখন ব্যবস্থা হলো বর্ণভিত্তিক।

যেকোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা বলা হয়। ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ। পৃথিবীর সকল ভাষার ধ্বনিসমূহ স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিতে বিভক্ত। বর্ণের ৩টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ – বর্ণের আকৃতি, বর্ণের উচ্চারণ ও বর্ণের নাম। লিখন দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়নে সঠিক প্রবাহ মেনে সঠিক আকৃতিতে বর্ণ লেখা গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি শব্দ বানান করার ক্ষেত্রে বর্ণের নাম গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শুধু ধ্বনিরূপ বা উচ্চারণ দিয়ে বানান করলে বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। নিচে বাংলা বর্ণমালার বর্ণসমূহের পরিচয় প্রদানের সঙ্গে বাংলা বর্ণের IPA ও বর্ণের নাম দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১২) অনুসরণ করা হয়েছে।

স্বরবর্ণ

স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে স্বরবর্ণ বলে। যেমন- অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি।

বাংলা স্বরবর্ণ

স্বরবর্ণ	বাংলাস্বরবর্ণের IPA	বর্ণের নাম
অ	ɔ	ʃɔreɔ [স্বরে অ]

স্বরবর্ণ	বাংলাস্বরবর্ণের IPA	বর্ণের নাম
আ	a	ʃɔrea [স্বরে আ]
ই	i	rhɔʃʃoi [হ্রস্ব ই]
ঈ	iː	dirghoi [দীর্ঘ ই]
উ	u	rhɔʃʃou [হ্রস্ব উ]
ঊ	uː	dirghou [দীর্ঘ উ]
ঋ	ri	ri [রি]
এ	e	e [এ]
অ্যা	æ	æ [অ্যা]
ঐ	oi̯	oi̯ [ওই্]
ও	o	o [ও]
ঔ	ou̯	ou̯ [ওউ্]

মাত্রাচিহ্ন বর্ণের অংশ, এটি বর্ণের উপরের একটি আনুভূমিক রেখা। বর্ণের জন্য মাত্রা গুরুত্বপূর্ণ, মাত্রাচিহ্নের ভিন্নতার জন্য উচ্চারণ ও অর্থ বিভ্রাট ঘটতে পারে। নিচে মাত্রাচিহ্ন অনুযায়ী বাংলা স্বরবর্ণসমূহের শ্রেণি দেখানো হলো –

পূর্ণমাত্রাযুক্ত বর্ণ	৬টি	অ আ ই ঈ উ ঊ
অর্ধমাত্রাযুক্ত বর্ণ	১টি	ঋ
মাত্রাহীন বর্ণ	৪টি	এ ঐ ও ঔ

স্বরবর্ণ যখন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন পূর্ণরূপ লেখা হয়। অ, আ, ই, এ ইত্যাদি।

স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ শব্দের শুরুতে, মাঝে ও শেষে তিন অবস্থানেই থাকতে পারে।

- শব্দের শুরুতে: আকাশ, ইলিশ, উপকার।
- শব্দের মাঝে: কুরআন, আউশ।
- শব্দের শেষে: বউ, জামাই।

কারচিহ্ন: স্বরবর্ণ যখন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে কারচিহ্নের আকৃতিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হতে পারে।

নাম	আকৃতি	সংযুক্ত রূপ
আ-কার	ঠ	খা যা
ই-কার	ড	দি বি
ঈ-কার	ঢ	কী লী
উ-কার	ণ	দু রু হু শু ন্তু
ঊ-কার	ূ	দূ রূ
ঋ-কার	ৃ	দৃ হৃ
এ-কার	ে	নে য়ে
ঐ-কার	ৈ	কৈ হৈ
ও-কার	ো	কো নো
ঔ-কার	ৌ	নৌ সৌ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন-ক, খ, ঘ, ঙ ইত্যাদি।

বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশটি (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগারো (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশ (৩৯)টি।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণ	বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের IPA	বর্ণের নাম
ক	k	kɔ [ক]
খ	k^h	khɔ [খ]
গ	g	gɔ [গ]
ঘ	gh	ghɔ [ঘ]
ঙ	ŋ	uo~ [উয়োঁ]
চ	c	cɔ [চ]
ছ	ch	chɔ [ছ]

ব্যঞ্জনবর্ণ	বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের IPA	বর্ণের নাম
প	p	pɔ [প]
ফ	ph	phɔ [ফ]
ব	b	bɔ [ব]
ভ	bh	bhɔ [ভ]
ম	m	mɔ [ম]
য	j	ɔntostho dzɔ [অন্তস্থ জ]
র	r	rɔ [র]

ব্যঞ্জনবর্ণ	বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের IPA	বর্ণের নাম
জ	dz	dzɔ [জ]
ঝ	dhz	dhzɔ [ঝ]
ঞ	n	io [ইয়োঁ]
ট	ṭ	ṭɔ [ট]
ঠ	ṭh	ṭhɔ [ঠ]
ড	ḍ	ḍɔ [ড]
ঢ	ḍh	ḍhɔ [ঢ]
ণ	n	murḍhonno nɔ [মূর্ধন্য ন]
ত	t	tɔ [ত]
থ	th	thɔ [থ]
দ	d	dɔ [দ]
ধ	dh	dhɔ [ধ]
ন	n	nɔ [ন]

ব্যঞ্জনবর্ণ	বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের IPA	বর্ণের নাম
ল	l	lɔ [ল]
শ	ʃ	talobboʃɔ [তালব্য শ]
ষ	ʃ	murḍhonnoʃɔ [মূর্ধন্য শ]
স	s	dɔntoʃɔ [দন্ত্য স]
হ	h	hɔ [হ]
ড়	ṛ	ḍhɔe bindu ṛ [ডয়ে বিন্দু ড়]
ঢ়	ṛh	ḍhɔe bindu ṛhɔ [ঢয়েবিন্দু ঢ়]
য়	y	ɔntosthoy [অন্তস্থ য়]
ৎ	t	khɔnḍo tɔ [খন্ড ত]
ং	ŋ	onuʃʃar [অনুস্বার]
ঃ	h	biʃɔrgo [বিসর্গ]
ঁ	~	cɔnḍro bindu [চন্দ্র বিন্দু]

মাত্রাচিহ্নের ভিত্তিতে ব্যঞ্জনবর্ণ

মাত্রাহীন বর্ণ	৬টি	ঙঞৎ ং ঃ ঁ
অর্ধমাত্রাযুক্ত বর্ণ	৭টি	খ গ ণ থ ধ প শ
পূর্ণমাত্রাযুক্ত বর্ণ	অবশিষ্ট ২৬টি বর্ণ	

ফলা

স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ বাব্যঞ্জবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে। যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয় তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ হয়।

য-ফলা	্য	ম্য	অদম্য
র-ফলা	্র	ম্র	আম্র
ব-ফলা	্ব	ম্ব	লম্ব
ম-ফলা	্ম	ম্ম	সম্মান
ন-ফলা	্ন	ম্ন	নিম্ন

ল-ফলা	্ল	ম্ল	ম্লান

বাংলা যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একত্রে লেখা হয়। এক্ষেত্রে যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোর আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। কখনও তা অস্বচ্ছ রূপ ধারণ করতে পারে। যেমন, ক্+ষ=ক্ষ। বাংলায় প্রায় আড়াইশো'র মতো যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ আছে। পঠন দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়নের জন্য বাংলার যুক্তবর্ণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ অপরিহার্য।

যুক্তব্যঞ্জন কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন- ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন।

- দ্বিত্বব্যঞ্জন: একই ব্যঞ্জন পর পর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বলে। যেমন-উচ্চ (চ্+চ), বিপন্ন (ন্+ন), সম্মান (ম্+ম) ইত্যাদি।
- সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন: দ্বিত্বব্যঞ্জন ছাড়া সব ব্যঞ্জন সংযোগকে সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন- ব্রহ্ম (হ্+ম), বন্ধ (ন্+ধ), রক্ত (ক্+ত)।

যুক্ত হওয়া ব্যঞ্জনবর্ণে সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে যুক্তব্যঞ্জনকে ভাগ করা হয়।

- দুটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ক্+ত = ক্ত : রক্ত
- তিনটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : জ্+জ্+ব = জ্জ্ব : উজ্জ্বল
- চারটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ন+ত+র-ফলা + য-ফলা = ন্ত্র্য : স্বাতন্ত্র্য

যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ

যুক্তব্যঞ্জনবর্ণে কোন কোন ব্যঞ্জন যুক্ত তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠপুস্তকে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জনগুলো সংকলন করে সেগুলোর মধ্যে ১০০টি বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো।

ক্ক= ক্+ক	ট্র= ট্+র	ন্ধ্য= ন্+ধ্+য	শ্ন=শ্+ন
ক্ত=ক্+ত	ড্ড=ড্+ড	ন্ন=ন্+ন	শ্ব=শ্+ব
ক্য=ক্+য	ণ্ট=ণ্+ট	ন্ম=ন্+ম	শ্র=শ্+র
ক্র=ক্+র	ণ্ঠ=ণ্+ঠ	প্ত=প্+ত	ষ্ক=ষ্+ক
ক্র্য=ক্+র্+য	ণ্ড=ণ্+ড	প্র=প্+র	ষ্ট=ষ্+ট
ক্ল=ক্+ল	ণ্য=ণ্+য	ব্দ=ব্+দ	ষ্ঠ=ষ্+ঠ
ক্ষ=ক্+ষ	ত্ত=ত্+ত	ব্ব=ব্+ব	ষ্ণ=ষ্+ণ
ক্ষ্ম=ক্+ষ্+ম	ত্থ=ত্+থ	ব্র=ব্+র	ষ্প=ষ্+প
ক্ষ্য=ক্+ষ্+য	ত্ন=ত্+ন	ভ্র=ভ্+র	ষ্ম=ষ্+ম
ক্স=ক্+স	ত্ব=ত্+ব	ম্প=ম্+প	স্ক=স্+ক
খ্য=খ্+য	ত্ম=ত্+ম	ম্ব=ম্+ব	স্ট=স্+ট
খ্র=খ্+র	ত্র=ত্+র	ম্ভ=ম্+ভ	স্ত=স্+ত
গ্র=গ্+র	থ্য=থ্+য	ম্ম=ম্+ম	স্ত্র=স্+ত্+র
ঘ্র=ঘ্+র	দ্দ=দ+দ	ম্র=ম্+র	স্থ=স্+থ

ঙ্ক=ঙ্+ক
ঙ্খ=ঙ্+খ
ঙ্গ=ঙ্+গ
চ্ছ=চ্+ছ
জ্জ=জ্+জ
জ্ঞ=জ্+ঞ
জ্ব=জ্+ব
জ্য=জ্+য
ঞ্চ=ঞ্+চ
ঞ্জ=ঞ্+জ
ট্ট=ট্+ট

দ্ধ=দ্+ধ
দ্ব=দ্+ব
দ্ম=দ্+ম
দ্র=দ্+র
ধ্ব=ধ্+ব
ন্ড=ন্+ড
ন্ত=ন্+ত
ন্ত্র=ন্+ত্+র
ন্দ=ন্+দ
ন্দ্র=ন্+দ্+র
ন্ধ=ন্+ধ

য্য=য্+য
র্ক=র্+ক
র্ঘ্য=র্+ঘ্+য
র্ণ=র্+ণ
র্য=র্+য
র্শ=র্+শ
র্ষ=র্+ষ
ল্গ=ল্+গ
ল্প=ল্+প
ল্ল=ল্+ল
শ্চ=শ্+চ

স্থ্য=স্+থ্+য
স্ন=স্+ন
স্প=স্+প
স্ব=স্+ব
স্ম=স্+ম
স্র=স্+র
স্ল=স্+ল
হ্ন=হ্+ন, হ্ণ=হ্+ণ
হ্ব=হ্+ব
হ্ম=হ্+ম
হ্য=হ্+য

বাংলা যুক্তবর্ণের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। একই ধ্বনির একাধিক বর্ণ-প্রতীক থাকায় যেমন উচ্চারণ বিভ্রাটের সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি বাংলায় ব্যবহৃত প্রায় আড়াই শ'র মতো যুক্তবর্ণের উচ্চারণেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। উচ্চারণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী কয়েকটি যুক্তবর্ণের উচ্চারণ-সূত্র নিচে আলোচনা করা হলো:

ক্ষ উচ্চারণরীতি

ক্ষ একটি যুক্তবর্ণ। 'ক্ + ষ' – মিলে হয় ক্ষ। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ 'ক্ষ' [যথা : দক্ষ (দক্ষ) ; পক্ষ (পক্ষ)]। কিন্তু বাংলায় ক্ষ-এর সেই উচ্চারণ রক্ষিত হয়নি। ক্ষ উচ্চারণের সূত্র নিচে উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো :

বাংলা ভাষায় পদের প্রথমে ক্ষ-এর উচ্চারণ স্পষ্ট খ-এর মতো হয়। যেমন : ক্ষত (খতো) ; ক্ষুধিত (খুধিতো) ; ক্ষান্ত (খান্তো) ; ক্ষমা (খমা) ; ক্ষমতা (খমোতা)।

পদের মধ্যে ও অন্তে ক্ষ-এর উচ্চারণ 'ক্খ'-এর মতো। যেমন : দক্ষ (দোক্খো) ; পক্ষ (পোক্খো) ; বক্ষ (বোক্খো) ; পরীক্ষা (পোরিক্খা) ; অক্ষম (অক্খোম্) ; পাক্ষিক (পাক্খিক্)।

জ্ঞ উচ্চারণরীতি

জ্ঞ যুক্তবর্ণটি জ্ + ঞ যোগে গঠিত। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল 'জ্ঞ' [অনেকটা জ্যঁ (জইঅঁ)]। কিন্তু বাংলায় জ্ঞ-এর সেই উচ্চারণ রক্ষিত হয়নি। জ্ঞ উচ্চারণের সূত্র নিচে উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো :

বাংলা ভাষায় পদের সূচনায় জ্ঞ-এর উচ্চারণ অনেকটা গঁ বা গ্যঁ-এর মতো। আবার জ্ঞ-এর সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলে প্রায়শ এ্যাঁ (্যাঁ) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন : জ্ঞান (গ্যাঁন্) ; জ্ঞাত (গ্যাঁতো) ; জ্ঞাতব্য (গ্যাঁতোব্‌বো) ইত্যাদি।

পদের মধ্যে বা অন্তে জ্ঞ উচ্চারিত হয় গ্গঁ-এর অনুরূপ। যেমন : বিজ্ঞান (বিগ্‌গ্যাঁন্) ; অনভিজ্ঞ (অনোভিগ্‌গোঁ) ; অজ্ঞাত (অগ্‌গ্যাঁতো)।

ব-ফলার উচ্চারণরীতি

শব্দের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে ব-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে ব-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। তবে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন : স্বদেশ (শদেশ্); স্বাধীন (শাধিন্); ত্বক (তক্); শ্বাস (শাশ্); ধ্বনি (ধোনি); স্বাগত (শাগতো)।

বাংলায় পদের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে থাকে। যেমন : দ্বিত্ব (দিত্‌তো); বিশ্ব (বিশ্‌শো); বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ্); বিদ্বান (বিদ্‌দান্); রাজত্ব (রাজোত্‌তো)।

উৎ (উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ'(দ্)-এর সঙ্গে ব-ফলার ব বাংলা উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন : উদ্বেগ (উদ্‌বেগ্); উদ্বোধন (উদ্‌বোধোন্); উদ্বাস্তু (উদ্‌বাস্‌তু); উদ্বিগ্ন (উদ্‌বিগ্‌নো)।

বাংলা শব্দে ক্ থেকে সন্ধির সূত্রে আগত গ-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : দিগ্বিদিক (দিগ্‌বিদিক্); দিগ্বলয় (দিগ্‌বলয়্); দিগ্বিজয় (দিগ্‌বিজয়্); ঋগ্বেদ (রিগ্‌বেদ্)।

ব এবং ম -এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে, সে ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : সব্বাই (শব্‌বাই); সাব্বাশ (শাব্‌বাশ্); তিব্বত (তিব্‌বত্); নব্বুই (নোব্‌বুই); বিম্ব (বিম্‌বো); লম্ব (লম্‌বো); নিতম্ব (নিতম্‌বো); সম্বোধন (শম্‌বোধোন্)।

তবে যুক্তবর্ণের সঙ্গে ব-ফলা সংযুক্ত হলে তার কোনো উচ্চারণ হয় না। যেমন : উচ্ছ্বাস (উচ্‌ছাশ্); দ্বন্দ্ব (দন্‌দো); সান্ত্বনা (শান্‌তোনা); তত্ত্ব (তত্‌তো)।

ম-ফলার উচ্চারণরীতি

শব্দের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে ম-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে ম-ফলাযুক্ত বর্ণটি সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়ে ওঠে। যেমন : স্মরণ (শঁরোন্); শ্মশান (শঁশান্); স্মৃতি (সৃঁতি); স্মারক (শাঁরোক্)।

শব্দের মধ্যে বা অন্তে ম-ফলা-সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। তবে এই ম যেহেতু নাসিক্য ধ্বনি সেজন্যে দ্বিত্ব উচ্চারিত শেষ ধ্বনিটি সাধারণত সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়। যেমন : ছদ্ম (ছদ্‌দোঁ); পদ্ম (পদ্‌দোঁ); আত্ম (আত্‌তোঁ); রশ্মি (রোশ্‌শিঁ); বিস্ময় (বিশশঁয়্)।

বাংলায় পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সর্বত্র ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না; গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত ম-এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন : বাগ্মী (বাগ্‌মি), যুগ্ম (জুগ্‌মো); বাঙ্ময় (বাঙ্‌ময়্); কুট্মল (কুট্‌মল্); হিরণ্ময় (হিরন্‌ময়্), মৃণ্ময় (মৃন্‌ময়্); জন্ম (জন্‌মো), উন্মাদ (উন্‌মাদ্); সম্মান (শম্‌মান্), সম্মতি (শম্‌মোতি); গুল্ম (গুল্‌মো), বাল্মীকি (বাল্‌মিকি)।

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত ম-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে এক্ষেত্রেও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ বর্ণটিকে প্রমিত উচ্চারণে সামান্য আনুনাসিক করে তোলে। যেমন : সূক্ষ্ম (শুক্‌খোঁ); লক্ষ্মী (লোক্‌খিঁ); লক্ষ্মণ (লক্‌খোঁন্); যক্ষ্মা (জক্‌খা)।

বাংলায় ব্যবহৃত ম-ফলাযুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দ আছে (কৃতঋণ শব্দ) যার বানান যেমন অবিকৃত, উচ্চারণেও সংস্কৃতরীতি অনুসৃত। যেমন : কুষ্মাণ্ড (কুশ্‌মান্‌ডো); স্মিত (স্মিতো); শুচিস্মিতা (শুচিশ্‌মিতা); কাশ্মীর (কাশ্‌মির)।

য-ফলার উচ্চারণরীতি

বাংলায় য-ফলা কখনও সংস্কৃতের মতো 'ইঅ' উচ্চারণ গ্রহণ করে না। বাংলায় পদের আদ্য বর্ণে য-ফলা যুক্ত হলে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে এবং বর্ণটি অ-কারান্ত বা আ-কারান্ত হলে প্রায়শ তার উচ্চারণ এ্যা-কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন: ব্যক্ত (ব্যাক্‌তো); ব্যর্থ (ব্যার্‌থো); ব্যগ্র (ব্যাগ্‌গ্রো); ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্‌); ব্যাহত (ব্যাহতো)। কিন্তু পদের আদ্য (অ-কারান্ত) বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত য-ফলার পরে যদি ই-কার বা ঈ-কার থাকে তবে সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ এ্যা-কারান্ত না হয়ে এ-কারান্ত হয়। যেমন : ব্যথিত (বেথিতো); ব্যতীত (বেতিতো); ব্যক্তি (বেক্‌তি);ব্যতিক্রম (বেতিক্‌ক্রোম্‌)।

পদের মধ্যে বা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে য-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ থাকে না। যেমন : সন্ধ্যা (শোন্‌ধা); স্বাস্থ্য (শাস্‌থো); সন্ন্যাসী (শোন্‌নাশি); বন্ধ্যা (বন্‌ধা)।

পদের মধ্য ও অন্ত্য বর্ণে য-ফলা সংযুক্ত হলে সেবর্ণটি দুবার উচ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে বর্ণটি অল্পপ্রাণ হলে প্রথমটি হসন্ত, দ্বিতীয়টি ও-কারান্ত, আর মহাপ্রাণ হলে প্রথমটি তার অল্পপ্রাণ হসন্ত এবং দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন: অদ্য (ওদ্‌দো); ধন্য (ধোন্‌নো); সত্য (শোত্‌তো); মধ্য (মোদ্‌ধো); লভ্য (লোব্‌ভো); কথ্য (কোত্‌থো)।

র-ফলার উচ্চারণরীতি

- পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে (র)-ফলা সংযুক্ত হলে (এবং বর্ণটিতে অন্য স্বরবর্ণ যুক্ত না থাকলে) তার উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়ে থাকে, সে-বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ্‌), প্রণাম (প্রোনাম), গ্রন্থ (গ্রোন্‌থো), গ্রহ (গ্রোহো), প্রতিজ্ঞা (প্রোতিগ্‌গাঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্‌গাঁ), ব্রত (ব্রোতো), ক্রম (ক্রোমো), শ্রম (স্রোম্‌)।
- (র) ফলা যদি পদের মধ্য কিংবা অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তবে সে-বর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। যেমন : বিদ্রোহ (বিদ্‌দ্রোহো), যাত্রী (জাত্‌ত্রি), রাত্রি (রাত্‌ত্রি), ছাত্র (ছাত্‌ত্রো), মাত্র (মাত্‌ত্রো), অভ্র (অব্‌ভ্রো), তীব্র (তিব্‌ব্রো), নম্র (নম্‌ম্রো), বজ্র (বজ্‌জ্রো), ধরিত্রী (ধোরিত্‌ত্রি), ধাত্রী (ধাত্‌ত্রি)।
- সংযুক্ত বর্ণে, (র)-ফলা যুক্ত হলে তার উচ্চারণ বিলুপ্ত হয় না (যদিও সে-বর্ণটির উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে না)। যথা: কম্প্র (কম্‌প্রো), অন্ধ্র (অন্‌ধ্রো), কৃচ্ছ্র (কৃচ্‌ছ্রো), কেন্দ্র (কেন্‌দ্রো), যন্ত্র (জনত্রো), অস্ত্র (অস্‌ত্রো), শস্ত্র (শস্‌ত্রো)।

ল-ফলার উচ্চারণরীতি

- পদের আদিতে বা প্রথমে ল-ফলা সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে এবং কোনো দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন : ক্লান্ত (ক্লান্‌তো), ম্লান (স্নান্‌), প্লাবন (প্লাবোন্‌), ক্লেশ (ক্লেশ্‌), গ্লানি (গ্লানি)।
- কিন্তু ল-ফলা সংযুক্ত বর্ণটি যখন পদের মধ্যে বা অন্তে বসে তখন তার উচ্চারণে র-ফলার মতোই দ্বিত্ব হয়। যেমন : অক্লান্ত (অক্‌ক্লান্‌তো), অম্লান (অম্‌ম্লান্‌), আপ্লুত (আপ্‌প্লুতো), বিপ্লব (বিপ্‌প্লব্‌), অক্লেশে (অক্‌ক্লেশে), শুক্লপক্ষ (শুক্‌ক্লোপোক্‌খো), আত্মগ্লানি (আত্‌তোঁগগ্লানি)।

হ সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণরীতি

হ আন্তঃস্বরযন্ত্রীয় বা কণ্ঠনালীয় মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি। এই হ যখন স্বাধীন বা স্বতন্ত্র বর্ণরূপে পদে ব্যবহৃত হয় তখন উচ্চারণে কোনো সমস্যারই সৃষ্টি হয় না কিন্তু এই বর্ণটি যখন ঋ-কার, ণ, ন, ম, য-ফলা, র-ফলা, ল, ব ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মতো ব্যবহৃত হয়, তখন উচ্চারণে নানা বৈচিত্র্য আসে। হ-যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে হ ধ্বনিটি মূলত মহাপ্রাণতা দান করে। যেখানে ব্যঞ্জনবর্ণটির নিজস্ব মহাপ্রাণ বর্ণ নেই সেখানে 'হ' নিজে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহাপ্রাণের মতো করে তোলে। সংযুক্ত হ বহুক্ষেত্রে উচ্চারণে স্থান পরিবর্তন করে এবং বর্ণে মহাপ্রাণতা সঞ্চার ও উচ্চারণ দ্বিত্ব বোধক করে থাকে।

হ-এর সঙ্গে ঋ-কার

বস্তুত হ এর সঙ্গে ঋ-কার, র-ফলা কিংবা সংযুক্ত হলে হ নয় র-ই মহাপ্রাণ হয়ে ওঠে। [তবে ঋ-কার যেহেতু 'কার' ফলা নয় তাই এখানে হ-এ-কার যুক্ত হলে হ-এর উচ্চারণ আগেই শোনা যায়, অন্যত্র হ-এর স্থান পরিবর্তন স্পষ্ট)] যেমন : হৃদয় (hriদয়্), আহৃত (আhriতো), সুহৃদ (শুhriদ্), হৃৎপিণ্ড (hriত্পিন্ডো), হৃদি (hriদি), হৃদ্য (hriদ্দো), হৃষ্ট (hriশটো) ইত্যাদি। এখানে হ-র উচ্চারণ ‘হিরি’ বা কেবল ‘রি’ নয় মহাপ্রাণ 'hri'।

হ-এর সঙ্গে র-ফলা

হ্রদ (rhcদ), হ্রস্ব (rhcশো), হ্রাস (rhaশ্), হ্রেষা (rheশা) প্রভৃতি। অতএব এখানেও হ্র-এর উচ্চরণ হ্র্ বা রহ নয় র্হ বা rh।

হ-এর সঙ্গে ণ বা ন যুক্ত (ন্হ nh)

পূর্বাহ্ণ, প্রাহ্ণ, চিহ্ন, মধ্যাহ্ন, বহ্নি, সায়াহ্ন ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণে হ্ণ কিংবা হ্ন আসলে ন-এরই মহাপ্রাণ রূপ। এখানে হ্ন ও হ্ণ নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয়। শব্দগুলোর উচ্চারিত রূপ হলো – পুর্‌বান্nho, অপোরান্nho, প্রান্nho, চিন্nho, মোদ্ধান্nho, বোন্nhi, শায়ান্nho।

হ-এর সঙ্গে ম সংযুক্ত (ম্হ mh)

ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণ – এ জাতীয় কতিপয় সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে মূলত ম-এর মহাপ্রাণ রূপই ধরা পড়ে। এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারে হ্ম-এর নাম ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। ফলে উল্লিখিত শব্দগুলোর উচ্চারণ: ব্রোম্mho, ব্রোম্mha, ব্রোম্mhaন্ডো, ব্রাম্mho, এবং ব্রাম্mhoন। কখনও ব্রোহ্মা, ব্রোম্মা কিংবা ব্রাহ্মোন্ অথবা ব্রাম্মোন্ জাতীয় নয়।

হ-এর সঙ্গে (য) ফলা

হ-এর সঙ্গে (য) ফলা যুক্ত হলে হ-এর নিজস্ব কোনো উচ্চারণ থাকে না, য (উচ্চারিত রূপ জ-এর মহাপ্রাণ ঝ আসবে)-এর দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, প্রথমটি অল্পপ্রাণ হসন্ত (জ্) এবং দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ (ঝ) ও-কারান্ত উচ্চারণ হয়ে থাকে। যেমন : উহ্য (উজ্ঝো), বাহ্য (বাজ্ঝো), গ্রাহ্য (গ্রাজ্ঝো), দাহ্য (দাজ্ঝো), সহ্য (শোজ্ঝো), মুহ্যমান (মুজঝোমান্), বাহ্য (বাজ্ঝো) গুহ্য (গুজ্ঝো), গৃহ্য (গজ্ঝো), লেহ্য (লেজ্ঝো), ঐতিহ্য (ওইতিজ্ঝো)।

হ-এর সঙ্গে ল

আহ্লাদ, হ্লাদ, হ্লাদিনী, প্রহ্লাদ – এ ধরনের কয়েকটি শব্দে যে হ্ল ব্যবহৃত সেটিও মূলত ল-এরই মহাপ্রাণ রূপ। কিন্তু আমাদের উচ্চারণে শব্দের প্রথমে হ্ল-এর মহাপ্রাণতা বিলুপ্ত হয়ে কেবল ল উচ্চারিত হয়, আবার মধ্য বা অন্তে মহাপ্রাণতা লোপ পেয়ে

কেবল ল-এর দ্বিত্ব হয়ে থাকে। যেমন লাদ্ (হ্লাদ), লাদিনি (হ্লদিনী) কিংবা আল্লাদ্ অথবা প্রোল্লাদ্। কিন্তু এর কোনোটিই প্রমিত উচ্চারণ নয়। উল্লিখিত শব্দগুলোর উচ্চারণ হওয়া উচিত আল্lhaদ্, lhaদিনি এবং প্রোল্lhaদ্।

হ-এর সঙ্গে ব

আহ্বান, গহ্বর, আহ্বায়ক, বিহ্বল, জিহ্বা – এধরনের কিছু শব্দে হ-এর সঙ্গে 'ব সংযুক্ত হওয়ার ফলে প্রথমত ব-এর পর (মহাপ্রাণ) ভ আসে এবং প্রকৃত পর্যায়ে উচ্চারিত হয় – আব্ভান্, গব্ভর্, আব্ভায়োক্ বিব্ভল্ ইত্যাদি। এরপর ব ও বা উ-তে পরিবর্তিত (ব-শ্রুতির ধারা অনুসারে) হয়ে বাঞ্ছিত উচ্চারণ দাঁড়ায় আওভান, গওভর্, আওভায়োক্, বিউভল্, জিউভা ইত্যাদি। এখানে জিহ্বা এবং বিহ্বল শব্দে আদ্য জ এবং ব-এ ই-কার থাকার জন্যে ব জাত ও কিছুটা উ-কারের মতো উচ্চারিত।

বাংলা শব্দ

ভাষা গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শব্দ। শব্দই ভাষার অর্থবোধক একক। বাক্য, অনুচ্ছেদ, রচনা কিংবা দীর্ঘ কোনো সাহিত্যকর্ম-সবকিছুই শব্দ দিয়েই নির্মিত। তাই শব্দকে ভাষার 'ভিত্তি' বলা হয়।

শব্দের আরেকটি বিশেষত্ব হলো এটি মানুষের মনের ভাবপ্রকাশের সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর মাধ্যম। শিশুরা যখন প্রথম ভাষা শেখে, তখন তারা এক একটি শব্দ শেখার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে ভাষাজ্ঞান অর্জন করে। শব্দের ভান্ডার যত সমৃদ্ধ হয়, ব্যক্তি তত দক্ষভাবে তার অনুভূতি ও চিন্তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। শব্দ ছাড়া কোনো ভাষা, যোগাযোগ বা সাহিত্য কল্পনা করা যায় না। শব্দের মধ্যে অর্থ, উচ্চারণ এবং ভাব প্রকাশের ক্ষমতা রয়েছে বলেই এটি ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য একক হিসেবে বিবেচিত।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

শব্দ গেঁথে-গেঁথেই আমাদের কথামালা। ভাষায় শব্দ উপাদানের ব্যাপারে যার-যার তার-তার এমনটা হয় না। শব্দভাণ্ডারে নিজের ভাষার প্রাচীন ও পরিবর্তিত শব্দ তো থাকবেই, তার সঙ্গে থাকবে অন্য ভাষার ধার করা শব্দ। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী গোষ্ঠী পরস্পর কাছে এসেছে, তাই শব্দের ব্যাপারে লেনদেন থাকবেই। বাংলা ভাষায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়।

উৎস বা উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়:

- তৎসম
- অর্ধতৎসম
- তদ্ভব
- দেশি
- বিদেশি

তৎসম শব্দ

সংস্কৃত থেকে সরাসরি যেসব শব্দ বাংলায় এসেছে তাকে আমরা তৎসম শব্দ বলি। তৎ অর্থাৎ সংস্কৃত । যা সংস্কৃতের মতো তাই তৎসম। সংস্কৃতের মতো বলতে উচ্চারণে পার্থক্য থাকলেও আকৃতিতে অর্থাৎ বানানে যা অপরিবর্তিত তাই তৎসম। এই শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে যেমন এসেছে, বাংলায় তেমনই ব্যবহৃত হয়। যেমন: অঙ্গ, আঘাত, ইষ্ট, ঈপ্সা, উদর, ঔষধ, ক্রোধ, ঝঞ্ঝা, বিদ্যা, সুর্য ইত্যাদি। একটি তৎসম শব্দের সঙ্গে অন্য আর একটি যুক্ত হয়ে বহুতর শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: অঙ্গসজ্জা, অঙ্গহানি, অক্ষিগোলক অগ্নিগর্ভ, অশ্বশক্তি প্রভৃতি।

অর্ধতৎসম শব্দ

অর্ধতৎসম শব্দ বাংলা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দভান্ডার উপাদান। এসব শব্দের উৎস সংস্কৃত ভাষা, তবে এরা তৎসম শব্দের মতো সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়নি। সময়ের সঙ্গে উচ্চারণ, বানান ও প্রয়োগে কিছুটা রূপান্তর ঘটেছে, যার ফলে শব্দগুলো তদ্ভব শব্দের মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নেয়নি, আবার তৎসম শব্দের মতোও বিশুদ্ধ বা মৌলিক রূপে রয়ে যায়নি। তাই অর্ধতৎসম শব্দকে বলা হয় তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মাঝামাঝি অবস্থানের শব্দ। ভাষার স্বাভাবিক প্রয়োগে এসব শব্দ সহজে উচ্চারণযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। অর্ধতৎসম শব্দ সাহিত্যিক ভাষাকে যেমন কোমলতা, সাবলীলতা ও সৌন্দর্য প্রদান করে, তেমনি তা কথ্য ভাষাকেও সমৃদ্ধ করে। সাধারণত তৎসম শব্দের জটিল ধ্বনি বা বর্ণ প্রয়োগকে সহজ করে বাংলা ভাষার ধ্বনিগত ও বানানগত নিয়মে মানিয়ে নেওয়ার ফলে অর্ধতৎসম শব্দের সৃষ্টি হয়। অর্ধতৎসম শব্দ বাংলা ভাষায় এমন এক শব্দ-শ্রেণি, যা ভাষার সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতা বজায় রেখে সংস্কৃত শব্দের স্বভাব ও মর্যাদাকেও ধারণ করে। এই শব্দগুলো বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং শব্দভাণ্ডারের পরিসর বৃদ্ধি করেছে। যেমন: মাতৃ> মাতা, পিতৃ>পিতা, গৃহিনী>গিন্নি, বৃষ্টি>বিষ্টি প্রভৃতি।

তদ্ভব শব্দ

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের আদি সম্পদ তদ্ভব শব্দ। সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলায় যেসব শব্দ স্থান করে নিয়েছে সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন: হস্ত > হত্থ > হাত, গাত্র > গতর > গা, অদ্য > অজ্জ > আজ প্রভৃতি। অর্ধতৎসম শব্দে অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যঙ্গ বা তীর্যক কটাক্ষের ভাব প্রকাশ পায়।

দেশি শব্দ

দেশি শব্দ মূলত এই ভূখণ্ডে প্রাচীনকালে বসবাসরত অনার্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, কোল, মুণ্ডাদের ব্যবহৃত শব্দ। যেমন: কুলো, চুলা, ডিঙি, গঞ্জ, খেয়া, ঝিঙা, ঢেঁকি, ঢোল প্রভৃতি।

বিদেশি শব্দ

বিদেশি শব্দ হলো বাংলা ভাষায় সেসব শব্দ, যেগুলো বিদেশি ভাষা থেকে ধার করে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দভাণ্ডারে যেসব শব্দ মূলত অন্য ভাষা থেকে এসেছে এবং বাংলা ভাষাভাষীরা উচ্চারণ, বানান বা প্রয়োগে সামান্য পরিবর্তন করে ব্যবহার করছে, সেগুলোকেই বিদেশি শব্দ বলা হয়। বাংলা ভাষার ইতিহাসে বহু শতাব্দী ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে বিভিন্ন দেশের ভাষা থেকে বাংলা বিদেশি শব্দ ধার করেছে। এ কারণে বাংলা শব্দভাণ্ডার ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। নানা দেশ থেকে সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারে অসংখ্য বিদেশি শব্দ যুক্ত হয়েছে। যেমন:

ইংরেজি: ফ্যান, বাস, রেডিও, কম্পিউটার
পর্তুগিজ: আলমারি, সাবান, আনারস
তুর্কি: তোশক, বাইজি, বেগম
উর্দু: আব্বু, কলিজা, বদলা
গুজরাটি: হরতাল, খদ্দর
আরবি: আদাব, আদালত, হালুয়া
ফার্সি: আইন, আফিম, আমদানি
ওলন্দাজ: ইস্ক্রুপ, হরতন, রুইতন, টেক্কা
ইতালীয়: মাফিয়া, ম্যাজেন্টা
মালয়: কিরিচ, আইলা
বর্মি: লুঙ্গি,ফুঙ্গি
মেক্সিকান: চকোলেট
পেরু: কুইনাইন
জার্মান: নাৎসি
তামিল: চুরুট
হিন্দি: কাহিনি, খেলনা,গদি
দক্ষিণ আফ্রিকান: জেব্রা
অস্ট্রেলীয়: বুমেরাং, ক্যাঙারু
সিংহলি: সিডর
ফরাসি: রেস্তোরাঁ, রেনেসাঁস, গালিচা
ডাচ: তামাক, লঙ্কা, গামলা, ক্যানভাস
চিনা: চা, চিনি,লিচু
তিব্বতি: লামা, চৌকি, চাটাই
দ্রাবিড় : কাঁথা, লাঙল, কোদাল
গ্রিক: সেমাই, ইউনানি
লাতিন: ক্যাম্পাস, ডক্টর, ফর্মুলা, রেজাল্ট
জাপানি: কারাতে, জুডো, হাসনাহেনা

গঠনগত দিক থেকে বাংলা শব্দাবলি দুইভাগে বিভক্ত ।

ক. মৌলিক শব্দ ও খ. সাধিত শব্দ

- **মৌলিক শব্দ:** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না সেসবকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন: জল, নাক, কান প্রভৃতি।
- **সাধিত শব্দ:** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায় সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। মূলত মৌলিক শব্দ ছাড়া অন্য যেকোনো শব্দই সাধিত শব্দ। একধিক শব্দের সমাস হয়ে বা ধাতু ও শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ হয়ে যে শব্দ গঠিত হয়,তা-ই সাধিত শব্দ। যেমন: লাঠি+ আল=লাঠিয়াল, মিঠা+আই=মিঠাই, দিন দিন=প্রতিদিনি প্রভৃতি।

অর্থগত দিক থেকে বাংলা শব্দকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

ক. যৌগিক শব্দ খ. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ গ. যোগরূঢ় শব্দ

- **যৌগিক শব্দ:** যে সব সাধিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও প্রচলিত অর্থের মধ্যে মিল আছে। অন্য কথায়, এ শব্দগুলো প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুসারে হয়। নবগঠিত শব্দের সঙ্গে প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয় না। যেমন: গম্+অন=গমন, যাওয়া বা যাওয়ার ভাব-এই প্রচলিত অর্থই শব্দটিতে বর্তমান।, জল+ঈয়=জলীয়। ‘ঈয়’ প্রত্যয়টি সম্বন্ধীয় অর্থে, জলীয় মানে জলসম্বন্ধীয়। এখানেও শব্দের অর্থের কোনো পরিবর্তন হয়নি।
- **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ:** রূঢ় শব্দের অর্থ কর্কশ বা অস্বাভাবিক। যে শব্দে প্রকৃতিপ্রত্যয়ের কোনও অর্থই প্রকাশিত না হয়ে লোকপ্রচলিত অন্য অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। অর্থাৎ প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগকৃত শব্দ যখন মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য অর্থ প্রকাশ করে। যেমন: প্রবীণ অর্থ যে প্রকৃষ্টভাবে বীণা বাজায় (প্র+বীণ)। কিন্তু এখন প্রবীণ অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন। অনুরূপ: হরিণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘হরণকারী’ কিন্তু আদৌ সে অর্থে ব্যবহার না হয়ে ‘হরিণ’ পশুবিশেষকে বোঝাচ্ছে। তাই হরিণ ‘রূঢ়’ শব্দ।
- **যোগরূঢ় শব্দ:** এই জাতীয় শব্দ একই সঙ্গে যৌগিক ও রূঢ় উভয় জাতীয় শব্দের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। অর্থাৎ এ ধরনের শব্দের অর্থে স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা উভয়ের সম্মিলন দেখা যায়। যেমন: পঙ্কজ>পঙ্কে জন্মে যা। পঙ্কে-জাত পদ্ম, শালুক,পাঁকালমাছ ইত্যাদি না বুঝিয়ে পঙ্কজ শব্দটি শুধুমাত্র পদ্মফুলকে বোঝাচ্ছে।

বাংলা বাক্য

যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাকে বাক্য বলে। বাক্যে পদের সার্থক প্রয়োগে বাক্য সুষম ও সুন্দর হয়ে ওঠে। তাই বিশুদ্ধ ও সুষম বাক্য গঠনে অর্থের দিকে গুরুত্ব দিতে হয়। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের এই অর্থ শক্তি তিন ধরনের-

- অভিধা বা বাচ্যার্থ: অভিধানে শব্দের যে অর্থ প্রকাশ করা হয় তাকে অভিধা বা বচ্যার্থ। যেমন-‘ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর’ অর্থ দিঘিতে পদ্মসমূহ ফুটেছে। এখানে ব্যাকরণ ও অভিধানের অর্থই প্রকাশ পেয়েছে।
- লক্ষণা বা লক্ষ্যার্থ: অভিধানের অর্থ প্রকাশ না করে অন্য বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তা লক্ষণা। যেমন- পাকা কথা দিয়ে এলাম। এখানে ‘পাকা’-এর আভিধানিক অর্থ প্রকাশ না করে ‘চূড়ান্ত’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ব্যঞ্জনা বা ব্যঞ্জার্থ: আভিধানিক ও লাক্ষণিক অর্থ প্রকাশ না করে বিশেষ ভাব প্রকাশ করে যা চমৎকার ও দীর্ঘস্থায়ী অনুরণনের সৃষ্টি করে। যেমন-

‘আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো।’

বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটা পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকতে হয়। কতকগুলো পদের সমষ্টি বাক্য হলেও,যেকোনো পদ সমষ্টি বাক্য নয়।

: আপনি কেমন আছেন?

: ভালো।

উপরের সংলাপে দুইটা বাক্য রয়েছে। প্রথমটিতে তিনটি শব্দ মিলে একটি বাক্য গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে একটি মাত্র শব্দে একটি বাক্য গঠিত হয়েছে। আসলে দ্বিতীয় সংলাপে কর্তা 'আমি' উহ্য রয়েছে। দুটো সংলাপেই বক্তার পুরো মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য শব্দ বা পদগুলো যথেচ্ছভাবে মিলিত হলেই বাক্য হয় না। এজন্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয় থাকতে হয়। এ ছাড়া একটি সার্থক বাক্যের কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা না থাকলে তাকে সার্থক বাংলা বাক্য বলা যায় না। সার্থক বাংলা বাক্যের গুণ তিনটি।

- আকাঙ্ক্ষা
- আসত্তি
- যোগ্যতা

আকাঙ্ক্ষা: কোনো একটি বাক্য শুরু করার পর শ্রোতার পুরো বাক্যটি শোনার ইচ্ছা জাগে। যদি বলা হয় – আজ সারাদিন ধরে...। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় আজ সারাদিন ধরে কী? বৃষ্টি? রোদ? নাকি তার অপেক্ষা করে আছি? অর্থাৎ বাক্যের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য আগ্রহকে পরিতৃপ্ত করে তাকে আকাঙ্ক্ষা বলতে পারি।

আসত্তি: আসত্তি মানে হলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ততা বা নৈকট্য। একটি বাক্যে শব্দ বা পদ যথেচ্ছভাবে সাজালে মনোভাব সঠিকভাবে প্রকাশ পায় না। তাকে সম্পর্কক্রমে সাজাতে হয়। বাক্যের ক্রমসজ্জাকে আসত্তি বলা যেতে পারে। যেমন কাল সারা রাত ছিল স্বপনের রাত গানের কলিটি যদি লিখি – রাত স্বপনের সারা কাল ছিল রাত, তাহলে গানের কলি হওয়াতো দূরের কথা, বাক্যই হয় না।

যোগ্যতা: বাক্যের শব্দসজ্জা ও সম্পূর্ণতা সবই ঠিক আছে কিন্তু অর্থটি ঠিক নেই তাহলে বাক্য সার্থক হয় না। যেমন: জল দিয়ে আগুন জ্বালাই। বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে সঠিক হলেও যৌক্তিকতাকে প্রতিফলিত করছে না। তাই বাক্যের অন্তর্গত ও ভাবগত মিলকে আমরা বলতে পারি যোগ্যতা। বাক্যের যোগ্যতার সাথে আরও কিছু বিষয় সম্পর্কিত যেমন–

দুর্বোধ্যতা: অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন- তুমি আমার - সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো। (চাতুরী বা মায়া অর্থে, কিন্তু বাংলা 'প্রপঞ্চ' শব্দটি অপ্রচলিত)।

উপমার ভুল প্রয়োগ: ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে বাক্য যোগ্যতার হারায়। যেমন - আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়। মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিত : আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো।

বাহুল্য-দোষ: প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন –

দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। 'আলেমগণ' বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে 'সব' শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য দোষ সৃষ্টি করেছে।

গুরুচণ্ডালী দোষ: তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচন্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। 'গরুর গাড়ি', 'শবদাহ', 'মড়াপোড়া' প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে 'গরুর শকট', 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ' প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

একটি বাক্যে দুইটি প্রধান অংশ থাকে- উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয়, বলে। যেমন –

খোকা এখন   বই পড়ছে

(উদ্দেশ্য)   (বিধেয়)

বাক্যের প্রাকারভেদ

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যেমন:

১) সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা: সাজ্জাদ বই পড়ে। এখনে সাজ্জাদ কর্তা এবং পড়ে সমাপিকা ক্রিয়া।

২) জটিল বাক্য: যে বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় যুক্ত মুখ্য অংশ ব্যতীত, এক বা একাধিক অপ্রধান খন্ড বাক্য বা বাক্যাংশ থাকে তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন: যে পরিশ্রম করে সেই সুখ লাভ করে। এখানে 'যে পরিশ্রম করে' নির্ভরশীল বাক্য এবং 'সেই সুখ লাভ করে' প্রধান খন্ড বাক্য।

৩) যৌগিক বাক্য: দুই বা ততোধিক সরল, জটিল অথবা সরল ও জটিল বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: লোকটি ধনী কিন্তু অসুখী।

অর্থ অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ

অর্থ অনুসারে বাক্যকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

১) বিবৃতিমূলক বাক্য: কোনো ঘটনা ভাব বা বক্তব্যের তথ্য যে বাক্য প্রকাশ করে তাকে বলা হয় বিবৃতিমূলক বাক্য। যেমন: সে একটি গল্পের বই পড়ছে। বিবৃতিমূলক বাক্য আবার দুই প্রকারের- হ্যাঁবোধক বাক্য এবং নাবোধক বাক্য ।

২) প্রশ্নবোধক বাক্য: কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য সম্পর্কে যে বাক্যে কোনো প্রশ্ন থাকে তাকে বলা হয় প্রশ্নবোধক বাক্য। যেমন: তোমার নাম কি?

৩) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য: অনুজ্ঞাসূচক বাক্য আজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, আমন্ত্রণ, নিষেধ ইত্যাদি প্রকাশ করে। যেমন: গুরুজনের কথা অমান্য করো না।

৪) প্রার্থনাসূচক বাক্য: যে বাক্যের মাধ্যমে কোনো প্রার্থনা প্রকাশ পায় তাকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন: প্রভু আমাদের দেশের মঙ্গল করুন।

৫) কার্যকারণাত্মক বাক্য: এইরূপ বাক্যে কোনো নিয়ম, স্বীকৃতি, শর্ত বা সংকেত দ্যোতিত হয়। যেমন: টাকা পেলে শোধ করে দেব।

৬) সন্দেহবোধক বাক্য: নির্দেশবাচক বাক্যে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়তা ইত্যাদির ভাব থাকলে তাকে সন্দেহবোধক বাক্য বলা হয়। যেমন: হয়তো সে আসবে না।

৭) বিস্ময়সূচক বাক্য: হর্ষ, বিস্ময়, দুঃখ, শোক, কাতরতা, করুণা, প্রশংসা, আবেগ বা উচ্ছ্বাসের আকস্মিকতা যে বাক্যে প্রকাশ পায় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলা হয়। যেমন: কী সুন্দর দৃশ্য!

৮) ইচ্ছাবোধক বাক্য: যে বাক্যে মনের কোনো ইছা প্রকাশিত হয় তাকে ইছাবোধক বাক্য বলে। যেমন: তুমি যেন পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হতে পার।

বাক্য গঠনের নিয়ম

- প্রতিটি বাক্যে থাকে কর্তা ও ক্রিয়াপদ।
- প্রতিটি বাক্যে কমপক্ষে একটি কর্তা ও একটি ক্রিয়া থাকা চাই।
- বাক্যের সাধারণ গঠন হলো : কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। যেমন : কর্তা – সুমি, কর্ম- বই, ক্রিয়া- পড়ে
- কর্তা ক্রিয়ার পরেও বসতে পারে। যেমন, তার নাম ছিল সুমন। এখানে সুমন হলো কর্তা।
- সাধারণত সম্বোধন পদ (যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়) বাক্যের শুরুতে বা সবার শেষে বসে। যেমন: শফিক, এদিকে এসো। এদিকে এসো শফিক। এখানে শফিক হচ্ছে সম্বোধন পদ।
- অনুজ্ঞা অর্থাৎ আদেশ, অনুরোধ বোঝাতে কর্তা উহ্য থাকে। যেমন: পড়তে বস। এ বাক্যে কর্তা হলো তুমি। বাক্যটি আসলে 'তুমি পড়তে বসো।' এখানে কর্তা 'তুমি' উহ্য রয়েছে।
- সংযোজক অব্যয় (ও, এবং, আর) দিয়ে একাধিক বিশেষ্য পদ সংযুক্ত থাকলে, সাধারণত শেষের পদটির সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : সে করিম ও রমার বন্ধু। বই, খাতা আর কাগজের দাম বাড়ল।
- আবেগ প্রকাশক অব্যয় পদ সাধারণত বাক্যের শুরুতে বসে। যেমন: আঃ কী আরাম! ওঃ কী দুঃখ!

ভাষারূপ

বাংলা ভাষার মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রুপ দেখা যায়। মৌখিক রুপ দুই ধরনের হয় চলিত প্রমিত রীতি ও আঞ্চলিক রীতি। লৈখিক বা লেখ্য ভাষারও দুটি রূপ আছে সাধু ও চলিত।

সাধু ও চলিতভাষা

সাধু ও চলিত ভাষা দুটির রূপের মধ্যে যেমন প্রকৃতিগত সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্যও রয়েছে। নিচে পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা

▪ যে ভাষায় সাধারণত সাহিত্য রচিত হয় এবং যা মার্জিত ও সর্বজনস্বীকৃত তাই সাধু ভাষা।	▪ শিক্ষিত লোক সাধারণ কথাবার্তায় যে ভাষা ব্যবহার করে থাকে তা চলিত ভাষা।
▪ সাধু ভাষা ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত নিয়মের অনুসারী।	▪ চলিত ভাষার সুনির্ধারিত ব্যাকরণ আজও তৈরি হয়নি।
▪ সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী।	▪ চলিত ভাষা সহজ ও স্বাভাবিক। এ ভাষা মানুষের মনোভাব প্রকাশে উপযোগী।
▪ সাধু ভাষার কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়।	▪ চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।
▪ সাধু ভাষা কৃত্রিম।	▪ চলিত ভাষা কৃত্রিমতা বর্জিত।
▪ সাধু ভাষা নাটকের সংলাপ, আলাপ - আলোচনা ও বক্তৃতায় তেমন উপযোগী নয়।	▪ চলিত ভাষা নাটকের সংলাপ, আলাপ - আলোচনা ও বক্তৃতায় বেশ উপযোগী।
▪ সাধু ভাষায় ক্রিয়া ও সর্বনাম পদগুলো সাধারণত দীর্ঘ হয়ে থাকে। যেমন-খাইতেছি, তাহারা ইত্যাদি।	▪ চলিত ভাষায় ক্রিয়া এবং সর্বনাম পদগুলো সংক্ষিপ্ত। যেমন-খাচ্ছি, তারা ইত্যাদি।
▪ এ ভাষা প্রাচীন।	▪ এটি আধুনিক।
▪ সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি।	▪ চলিত ভাষায় অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বেশি।
▪ সাধু ভাষায় অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার নেই।	▪ চলিত ভাষায় এদের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

প্রমিত ও আঞ্চলিক ভাষারীতি

বাংলা প্রমিত ভাষার যা নির্দিষ্ট নিয়ম, ব্যাকরণ, উচ্চারণ ও রীতি অনুসারে গঠিত। এটি সাধারণত শিক্ষায়, প্রশাসনে, গণমাধ্যমে ও সাহিত্যচর্চায় ব্যবহৃত হয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য ভাষার রূপই হলো আঞ্চলিক ভাষা। অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর উচ্চারণ, শব্দভাণ্ডার ও বাক্যগঠন পরিবর্তিত হয়।

প্রমিত ও আঞ্চলিক ভাষারীতি

বাংলা প্রমিত ভাষা যা নির্দিষ্ট নিয়ম, ব্যাকরণ, উচ্চারণ ও রীতি অনুসারে গঠিত। সাধারণত আনুষ্ঠানিক চর্চায়, শিক্ষায়, প্রশাসনে, গণমাধ্যমে ও সাহিত্য চর্চায় ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য ভাষার রূপই হলো আঞ্চলিক ভাষা। অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উচ্চারণ, শব্দভাণ্ডার ও বাক্যগঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভাষার অলঙ্কার হলো আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষাকে ভাষার প্রাণও বলা যায়।

উদাহরণস্বরূপ– আমি বাড়ি যাই।

বাক্যটি রংপুর অঞ্চলে- মুই বাড়িত যাওছল/যাং।

বগুড়ায়- হামি বাড়িত যামু।

চট্টগ্রামে- আঁই বাড়িত যাইর।

কুমিল্লায়- আমি বাইত যাই।

সিরাজগঞ্জে- আমি বাড়িত যাবোনে।

মৌলভীবাজারে- আমি বাড়িত যাইয়ারগি।

নোয়াখালীতে- আঁয় বাইত্তে যাইয়ের।

এভাবে আঞ্চলিক ভাষার ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

অধ্যায় ৪

বাংলা পঠন শিখনের মৌলিক উপাদান

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পঠন দক্ষতা ও পড়ার অভ্যাস সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পঠন দক্ষতা ও পড়ার অভ্যাস একে অপরের পরিপূরক এবং একটি আরেকটির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। পড়তে শেখার (learn to read) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাঝে ক্রমেই পড়ে শেখার (read to learn) সক্ষমতা অর্জিত হয়। শিশুর পড়ার সক্ষমতা কেবল ভাষার নৈপুণ্য অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাই নয়, এটি শিশুর সকল শিখনের ভিত্তি ও সাফল্যের অনুঘটক। পড়ার সক্ষমতা শিশুর জ্ঞানভাণ্ডারকে প্রসারিত করে এবং অন্যান্য বিষয়ে শিখনফল অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এজন্য বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর পঠন দক্ষতার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় পঠন দক্ষতা অর্জনের অঙ্গীকারের প্রতিফলন বিদ্যমান।

বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের জন্য প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষার্থী তখনই স্বাধীন ও দক্ষ পাঠক হয়ে ওঠে, যখন সে প্রথমে লিখিত সাংকেতিক চিহ্ন বা বর্ণকে ধ্বনির সাথে মিলিয়ে শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে পারে এবং পরবর্তীতে পাঠ্যাংশের ভাব ও তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ পড়ার মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে দুটি ধাপে-ডিকোডিং (Decoding) এবং বোঝাপড়া (Understanding)

এই দুই ধাপ সফলভাবে আয়ত্ত করতে হলে শিশুর পঠন দক্ষতার পাঁচটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মূল উপাদান ধ্বনি সচেতনতা, বর্ণজ্ঞান বা ফোনিক্স, শব্দভাণ্ডার, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা-সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে শেখানো অপরিহার্য। গবেষণা প্রমাণ করে যে এই পাঁচটি উপাদান শিশুদের পড়তে শেখা, পাঠোদ্ধার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে উচ্চতর ভাষিক দক্ষতার জন্য সবচেয়ে কার্যকর ভিত্তি তৈরি করে।

এ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীগণ পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা কী, পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার সম্পর্ক, পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা কেন প্রয়োজন, প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়ে পড়তে শেখার প্রয়োজনীয় দিকসমূহ, পড়তে শেখার পাঁচটি মৌলিক

উপাদান কী, কেন প্রয়োজন, কাজসমূহ এবং শ্রেণিকক্ষে এর বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার ধারণা

পড়া/পঠন (Reading) বলতে কী বোঝায়?

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন চিনতে পারার মাধ্যমে পাঠোদ্ধার করতে পারা এবং অর্থ বুঝতে পারাই হচ্ছে পড়া। এটি একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িত আছে বর্ণ ও শব্দ চিনতে পারা, শব্দের অর্থ বুঝতে পারা, সাবলীলতা অর্জন এবং সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা।

পড়ার দুইটি অংশ থাকে-

- সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসাবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দ বা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারা, যাকে বলা হয় পাঠোদ্ধার (Decoding)।
- লিখিত শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে পারার মাধ্যমে সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা, যাকে বলা হয় বোধগম্যতা (Understanding)।

পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার সম্পর্ক

পড়তে শেখা	পড়ে শেখা
- পড়তে পারার আগে এবং পড়ার সময়ের প্রচেষ্টাই হলো পড়তে শেখা। যেমন, ধ্বনি ও বর্ণ চিহ্নিত করতে পারা, কার-চিহ্ন ও ফলাচিহ্নের ব্যবহার জানা, শব্দাংশ ও শব্দ পড়া ইত্যাদি। - পড়তে শেখায় বড়দের সহায়তা প্রয়োজন। - পড়তে শেখার ভিত্তি হলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা। - পড়তে শেখা পড়ার পাঁচটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। - পড়তে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠক হতে সহায়তা করে।	- পড়তে শেখার পরের ধাপই হলো পড়ে শেখা। পড়ার মাধ্যমে অর্থ বোঝার প্রচেষ্টাই এখানে মুখ্য। - পড়ে শেখার ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তা সব সময় প্রয়োজন হয় না। - পড়ে শেখার ভিত্তি হলো লিখিত ভাষা। - পড়ে শেখা পড়তে শেখার ওপর নির্ভরশীল। - পড়ে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠকে পরিণত করে।

পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার গুরুত্ব

প্রাথমিক স্তরে পড়ার দুটি স্তর রয়েছে- পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা। আমাদের দেশের প্রাথমিক স্তরের পঠন দক্ষতা অর্জনের পর্যায়কে দুটি স্তরে বিভাজন করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের পড়তে শেখা দক্ষতা অর্জনের পর্যায়। এ স্তরে শিশু ভাষার মৌলিক দক্ষতাগুলো (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) অর্জনের কৌশলসমূহ শিখে থাকে।বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমে এই ভাষার মৌলিক দক্ষতাগুলোকে (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) কেন্দ্র করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। একটি শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ শুরুর পূর্ব থেকেই ভাষা দক্ষতা- শোনা, বলা দুটি পরিবার ও পরিবেশ থেকে শিখে থাকে। এক্ষেত্রে ভাষা দক্ষতা-

পড়া ও লেখা এ দুটি পরিকল্পিতভাবে শেখানো হয়। বাংলা ভাষার দক্ষতাসমূহ যেমন- বর্ণ চেনা, লেখা, বর্ণের উচ্চারণ, বর্ণযোগে শব্দাংশ বা শব্দ তৈরি, শব্দ পড়া, বাক্য তৈরি, বাক্য পড়া, অনুচ্ছেদ পড়া এবং বোদগম্যতার কাজসমূহ পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হবে। একজন শিশু যখন পড়তে শিখবে তখনই সে নতুন নতুন পাঠ্য বিষয় পড়ে বুঝতে পারবে। মাতৃভাষা পড়তে শিখলেই অন্য ভাষা ব্যতীত সকল বিষয় শিশু পড়ে শিখতে পারবে। সুতরাং প্রাথমিক স্তরের প্ররম্ভিক পর্যায়ে পড়তে শেখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পড়তে শেখাকে প্রাথমিক স্তরের প্রবেশদ্বার বলা হয়। এ বিষয়টি বিবেচনা করে National Reading Panel in USA (২০০০)- এর একদল আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ শতাধিক গবেষণাপত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রারম্ভিক পর্যায়ে পড়তে শেখার গুরুত্বের যথার্থতা নির্ধারণ করেছেন যে এই দক্ষতা অর্জন করলেই শুধুমাত্র শিশুর পড়ে শেখার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

- পড়তে শেখা শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে;
- পড়তে শেখাশিশুকে বই পড়তে এবং পাঠ্যাভ্যাস গঠনে সহায়তা করে;
- পড়তে শেখা শিশুকে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে আগ্রহী করে এবং সুশিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে;
- আনন্দের সাথে পাঠ করলে তথ্য অর্জনের পাশাপাশি যথেষ্ট বিনোদনও লাভ করা যায়। এই বিনোদন শিশুর জ্ঞানস্পৃহাকে বাড়িয়ে দেয়;
- শিশুর শব্দরাজ্য বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো পড়তে শেখা;
- পড়তে শেখারমাধ্যমে শিশু বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য আহরণ করে;
- মনীষীদের জীবনী ও অন্যান্য বিষয় পড়ার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ, নান্দনিকতা, পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে শিশু পরিচিত হয়;
- পড়তে শেখা শিশুকে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল মানুষ হিসেবে বিকাশে সহায়তা করে;
- শিশুর সব বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা সামগ্রিক অর্জন নিরূপণে পড়তে শেখাএকটি কার্যকর মাপকাঠি;
- উচ্চারণে শুদ্ধতা অর্জনের জন্য পড়তে শেখা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়ে পড়তে শেখার প্রয়োজনীয় দিক

পড়তে ও লিখতে শেখা একটি মৌলিক দক্ষতা। এই মৌলিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিশুরা পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে নিজে নিজে পড়ে জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখতে পারে। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষার শুরুতেই যে বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি তা হলো শিশুদের পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন করা। প্রথম শ্রেণিতেই এই দক্ষতা অর্জনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। যদি একটি শিশু প্রথম শ্রেণিতে কাঙ্খিত পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন করতে না পারে, তবে প্রাথমিক স্তরের পরের শ্রেণিগুলিতেও সে পিছিয়েই থাকবে। পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে থাকার অর্থ হলো সে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য বিষয়েও ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়বে। প্রাথমিক স্তরে, বিশেষ করে প্রথম শ্রেণিতে পড়া ও লেখার প্রত্যাশিত মৌলিক দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম ও অপরিহার্য।

সফলভাবে ভাষাদক্ষতা অর্জনের জন্য একটি পরিকল্পিত ভাষাশিখন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিশুদের অগ্রসর হতে হয়। ভাষাদক্ষতাসমূহ হঠাৎ করে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে অর্জিত হয় না। একটি পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নধারার আওতায় ভাষাদক্ষতাসমূহ অর্জিত হয়। মাতৃভাষায় শোনা ও বলার দক্ষতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জিত হলেও এর সফল ও কার্যকর উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের আওতায় অনুশীলন করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্যও প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক শিখন কর্মকাণ্ড। ভাষাদক্ষতা অর্জনের এই সব বিশেষ দিকসমূহ বিবেচনা করে ভাষাশিখনের কর্মকাণ্ডকে কয়েকটি পর্বে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পর্বসমূহ হচ্ছে:

- প্রাক পঠন-লিখন
- বর্ণ পরিচয়
- শব্দ-বাক্য
- ভাষা যোগাযোগ ও বোধগম্যতা

পরিপূর্ণভাবে পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ে পড়া ও লেখা সংশ্লিষ্ট কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন হয়। যেমন: যেকোনো কিছু পড়তে পারার আগে শিশুদের জানা প্রয়োজন যে, কোনো লিখিত পাঠ্যাংশের মাধ্যমে একটি অর্থপূর্ণ পরিস্থিতি, অবস্থা বা ঘটনা নির্দেশিত হয়। পড়তে পারার আগে জানা প্রয়োজন কীভাবে পাঠ্যপুস্তক ধরতে হয়, কোন দিক থেকে কোন দিকে (বাংলা ভাষায় বাম থেকে ডানে) পড়তে হয় ইত্যাদি। তাছাড়া পড়ার দক্ষতা অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ে উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয় ছাড়াও ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, বাক্য, বোধগম্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুদের দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। ভাষাশিখনের প্রাথমিক অবস্থায় শোনা ও বলার ধারাবাহিক অনুশীলনের পাশাপাশি পড়া ও লেখার জন্য নিচের ক্ষেত্রসমূহ শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষাশিখনের বিভিন্ন পর্বসমূহের যথাযথ অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। শ্রেণিকক্ষে ভাষাশিখনের বিভিন্ন পর্বের ধারাবাহিক ও কার্যকর অনুশীলন শিশুকে ভাষার দক্ষতাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস গঠনের মাধ্যমে স্বাধীন পাঠক হিসাবে গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা মূলত পড়তে শেখার পাঁচটি উপদানের ভিত্তিতে তৈরি হয়।

পড়ার এই পাঁচটি উপাদান হলো-

- ধ্বনি সচেতনতা
- ফোনিক্স/বর্ণজ্ঞান
- শব্দভাণ্ডার
- পঠন সাবলীলতা
- বোধগম্যতা

ধ্বনি সচেতনতা কী?

ধ্বনি সচেতনতা হচ্ছে আওয়াজ/ধ্বনি শুনে চিহ্নিত করতে পারা ও পরিবর্তন করতে পারার সামর্থ্য। ধ্বনি সচেতনতা পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। এটা সম্পূর্ণ মৌখিক। ধ্বনি সচেতনতার ফলে শিক্ষার্থীরা –

- বিভিন্ন ধ্বনিসমূহের জন্য নির্ধারিত প্রতীক হিসেবে সংশ্লিষ্ট বর্ণ শনাক্ত করতে পারে;
- বিভিন্ন শব্দের মাঝে নির্দিষ্ট বর্ণের অবস্থান শনাক্ত করতে পারে;
- শব্দের মাঝে সন্নিবেশিত বর্ণ/ধ্বনিসমূহ একে একে পৃথক করতে পারে;
- সহজ শব্দাংশের সমন্বয়ে শব্দ তৈরি করতে পারে;

- শব্দের মাঝে বর্ণের পরিবর্তন শব্দের ধ্বনিগত উচ্চারণ ও অর্থ কীভাবে পরিবর্তন করে-তা বুঝতে পারে;
- বিভিন্ন পরিচিত/অপরিচিত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে।

ধ্বনি সচেতনতা প্রয়োজন কেন?

পড়তে শেখার দক্ষতা অর্জনে ধ্বনি সচেতনতা হচ্ছে প্রথম ধাপ। শিশুদের ধ্বনি সচেতনতা শেখানো দরকার। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে, ধ্বনি সচেতনতায় দক্ষ না হওয়ার কারণে অনেক শিশু সঠিকভাবে পড়তে পারে না।

শিশুরা নির্দিষ্ট বর্ণের উচ্চারিত ধ্বনি সম্পর্কে যত বেশি সচেতন ও দক্ষ হবে তত সহজে পড়তে পারবে।

- শিশুদের পঠন নির্ভর করে উচ্চারিত ধ্বনিগুলো একসাথে করে শব্দ তৈরির সক্ষমতার ওপর;
- ধ্বনি সচেতনতা লিখিত বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যকার সম্পর্ক বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে;
- শিশুদের পড়া নির্ভর করে বিভিন্ন ধ্বনির সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারার ওপর;
- লেখা ও সঠিক বানান নির্ভর করে একটি শব্দকে ভেঙে এর ধ্বনিগুলোকে আলাদা করতে পারার ওপর;

শিশুরা ধ্বনি সচেতনতায় যত বেশি ভালো হবে, নির্দিষ্ট বর্ণের সাথে নির্দিষ্ট উচ্চারিত ধ্বনি মেলানো তাদের জন্য আরও সহজ হয়ে যাবে এবং এটা তাদের পড়তে সাহায্য করবে।

ধ্বনি সচেতনতার কাজ:

ধ্বনি সচেতনতার কাজ ৩টি

- ধ্বনি চিহ্নিতকরণ (Sound Identification)
- ধ্বনির মিলকরণ (Blending)
- শব্দ বা শব্দাংশের ধ্বনি বিভক্তিকরণ (Segmenting)

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ (Sound Identification):

ধ্বনি সচেতনতার ৩টি কাজের প্রথমটি হলো ধ্বনি চিহ্নিতকরণ। ধ্বনি চিহ্নিতকরণের কাজটি ৩টি ধাপে করা হয়।

ধাপ-১: এ ধাপে শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান। ধাপ-২: এ পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসাথে করেন এবং ধাপ-৩: এ ধাপে শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

এখন ধ্বনি চিহ্নিতকরণ এর কাজটি শ্রেণিকক্ষে কীভাবে হয় তার একটি চর্চা দেখবো-

ধাপ-১:

শিক্ষক: আমি একটি শব্দ বলছি। শব্দটি হচ্ছে ওজন। ওজন শব্দটির প্রথম ধ্বনি /ও/। শিক্ষক: এখন আমি আরেকটি শব্দ বলছি। শব্দটি হচ্ছে ওল। ওল শব্দটির প্রথম ধ্বনিও /ও/। ওজন এবং ওল এর প্রথম ধ্বনি /ও/ (শিক্ষক ধ্বনিটি দুবার বলবে) এখন আমরা একটি খেলা খেলব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /ও/ হয়, তাহলে আমি হাত উঠাব। আর যদি /ও/ না হয়, তবে হাত ওঠাব না। শব্দটি হচ্ছে ওজন, বলে শিক্ষক হাত ওঠাবেন। এর প্রথম ধ্বনি /ও/। তাই আমি হাত ওঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে মগ (এবার শিক্ষক হাত উঠাবেন না)। এর প্রথম ধ্বনি/ও/ না। তাই আমি হাত ওঠালাম না।

ধাপ-২:

শিক্ষক-শিক্ষার্থী: এবার আমরা একসঙ্গে করব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /ও/ হয়, তাহলে আমরা হাত ওঠাব। আর যদি না হয়, তবে হাত ওঠাব না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে ওজন। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই হাত ওঠাবে) শিক্ষক: ওজন শব্দের প্রথম ধ্বনি /ও/। তাই আমরা হাত ওঠালাম। শিক্ষক: আরেকটি শব্দ হচ্ছে মগ। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হাত ওঠাবে না) শিক্ষক: মগ-এর প্রথম ধ্বনি /ও/ নয়। তাই আমরা হাত ওঠালাম না।

ধাপ-৩:

শিক্ষক: এবার তোমরা করবে। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /ও/ হয়, তাহলে তোমরা হাত ওঠাবে। আর যদি না হয়, তবে হাত ওঠাবে না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে ওষুধ। (শিক্ষার্থীরা হাত ওঠাবে) শিক্ষক: আরেকটি শব্দ হচ্ছে থালা। (শিক্ষার্থীরা হাত ওঠাবে না) শিক্ষক একইভাবে ওজন, কলা, ওপার শব্দ দিয়ে হাত ওঠানোর খেলা খেলবে।

ধ্বনি মিলকরণ (Blending)

ধ্বনি সচেতনতার ৩টি কাজের ২য় কাজটি হলো ধ্বনি মিলকরণ এবং এটি তিন ধাপে করা হয়।

ধাপ-১: এ ধাপে শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান। ধাপ-২: এ পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসাথে করেন এবং ধাপ-৩: এ ধাপে শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

ধাপ-১:

শিক্ষক: আজ আমরা কীভাবে কতকগুলো ধ্বনি মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে হয় তা দেখবো। আমি কিছু ধ্বনি বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোন। শিক্ষক: /ও/ /খা/ /নে/- ওখানে। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। আর শব্দটি বলার সময় দুইটি ভাগকে একত্রে মেশানোর ভঙ্গি করবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন।)

ধাপ-২:

শিক্ষক: এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: /ও/ /খা/ /নে/- ওখানে। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ-১ এর মতো হাতে ধ্বনি মিলকরণের কাজটি করবে।)

ধাপ-৩:

শিক্ষক: এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে। শিক্ষার্থী: /ও/ /খা/ /নে/- ওখানে। (শিক্ষক ধাপ ১, ২ ও ৩ অনুসরণ করে ওজন শব্দটির ধ্বনি মিলকরণের কাজ করবেন।

শব্দের ধ্বনি বিভক্তিকরণ (Segmenting):

ধ্বনি সচেতনতার ৩টি কাজের ৩য় কাজটি হলো ধ্বনি বিভক্তিকরণ এবং এটি তিন ধাপে করা হয়।

ধাপ-১: এ ধাপে শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান। ধাপ-২: এ পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসাথে করেন এবং ধাপ-৩: এ ধাপে শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

ধাপ-১:

শিক্ষক: আমরা আগেই কতকগুলো ধ্বনি/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে শিখেছি। আমি আজকেও কিছু ধ্বনি/শব্দাংশ বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোন। শিক্ষক: /ও/ /ল/ - ওল। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। আর শব্দটি বলার সময় দুটো ভাগকে একত্রে মেশানোর ভঙ্গি করবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন।) শিক্ষক: ঠিক একইভাবে আমরা ওল শব্দটিকে বিভক্তি করা শিখব। এবার আমরা দেখি ওল শব্দটির মধ্যে কী কী ধ্বনি আছে। শিক্ষক: ওল - /ও/ /ল/। এখানে ওল শব্দটিতে দুটি ধ্বনি আছে। প্রথম ধ্বনিটি /ও/ এবং শেষের ধ্বনিটি হলো /ল/।(এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে শব্দটি দেখাবেন, তারপর একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন।

ধাপ-২:

শিক্ষক: এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: ওল -/ও/ /ল/। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ-১-এর মতো হাতে শব্দ বিভক্তিকরণের কাজটি করবে।

ধাপ-৩:

শিক্ষক: এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে। শিক্ষার্থী: ওল - /ও/ /ল/। (শিক্ষক ধাপ ১,২ ও ৩ অনুসরণ করে চক শব্দ দিয়ে শব্দের ধ্বনি বিভক্তিকরণের কাজ করবেন।

প্রারম্ভিক স্তরে ধ্বনি সচেতনতা, ফোনিক্স, শব্দভাণ্ডার, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা — এই পাঁচটি উপাদান শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে শিশুরা স্বাধীন ও দক্ষ পাঠক হিসেবে গড়ে ওঠে। শিক্ষক-মডেলিং ও ধাপে ধাপে (চিহ্নিতকরণ, মিলকরণ, বিভক্তিকরণ) অনুশীলনের মাধ্যমে এই দক্ষতাগুলি পরিকল্পিতভাবে শেখানো অত্যাবশ্যক।

পড়ার মৌলিক দুটি ধাপ-Decoding ও Understanding-সঠিকভাবে আয়ত্তের জন্য ধ্বনি সচেতনতা প্রথম ধাপ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব রাখে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে প্রথমে মডেলিং করতে হবে, এরপর সহযোগী অনুশীলন এবং অবশেষে শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র চর্চার সুযোগ দিতে হবে; বিশেষত ধ্বনি চিহ্নিতকরণ, ধ্বনি মিলকরণ ও ধ্বনি বিভক্তিকরণের সুসংগত কার্যক্রম শিশুদের শক্ত ভিত গড়ে তুলবে এবং স্থায়ী পাঠাভ্যাস গঠনে সহায়তা করবে।

বর্ণজ্ঞান বা ফোনিক্স কী?

বর্ণজ্ঞান/ ফোনিক্স হলো উচ্চারিত শব্দের ধ্বনির লিখিত রূপ যা ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যকার সম্পর্ক এবং এর রীতি বুঝতে সহায়তা করে। পড়া, লেখা এবং সাধারণ কিছু বাক্যের উপর ভিত্তি করে এর কাজগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কার্যক্রমটি মূলত স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও কারচিহ্ন শিখনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যার ফলে শিক্ষার্থীরা এগুলো মিল করে পড়তে পারে। তাছাড়াও এটি শব্দ ভেঙে পড়া এবং লেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ, /ম/ ধ্বনিটি লিখিত আকারে বোঝাতে 'ম' বর্ণটি ব্যবহৃত হয়। আবার /চ/ ধ্বনিটি লিখিত আকারে বোঝাতে 'চ বর্ণটি ব্যবহৃত হয়।

বর্ণজ্ঞান বা ফোনিক্স প্রয়োজন কেন?

- শব্দের ধ্বনি চিহ্নিত করার জন্য উক্ত ধ্বনির লিখিত রূপ জানাটা খুব প্রয়োজন। তাই ধ্বনির বর্ণ কেমন, তা শেখানোটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যখন শিশুরা বর্ণের ধ্বনি এবং বর্ণ শিখে ফেলে, তখন তারা এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অপরিচিত শব্দ পড়তে ও লিখতে পারে।
- বর্ণজ্ঞান/ ফোনিক্স শিক্ষণ খুবই প্রয়োজন। কারণ এটা শিক্ষার্থীকে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে। এমনকি শিক্ষার্থী জানে না এমন শব্দও সে পড়তে সক্ষম হয়।
- শিশুরা যারা শব্দকে ভাঙতে পারে, তারা শব্দকে কীভাবে পড়তে হয় তা দ্রুত আয়ত্ত করতে বর্ণজ্ঞান/ ফোনিক্স প্রয়োজন।
- বর্ণজ্ঞান/ ফোনিক্স চর্চা শিক্ষার্থীকে শব্দের অন্তর্গত বর্ণের ধ্বনি মিল করে পড়তে ও লিখতে শেখানোর জন্য প্রয়োজন।
- পড়া হচ্ছে লিখিত বর্ণ ও শব্দকে ধ্বনিতে রূপান্তর করা।
- লেখা হচ্ছে ধ্বনিকে বর্ণ ও শব্দে পরিবর্তন করা।
- গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, বর্ণ-ধ্বনির সমন্বয় শিশুর পড়ার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়।
- ফোনিক্স বোধগম্যতার উন্নয়ন ঘটায় এবং একইসাথে শিক্ষার্থীর স্কুল জীবনের প্রথমদিকে বানানের ক্ষেত্রেও সহায়তা করে।

বর্ণজ্ঞান/ ফোনিক্স-এর কাজ

- বর্ণ চিহ্নিতকরণ (Letter Identification)
- বর্ণ লেখা (Letter Writing)
- বর্ণের সাথে ছবির মিলকরণ
- বর্ণের/ শব্দাংশের মিলকরণ (Blending Letters)
- বর্ণ ও চিহ্নের মিলকরণ (Blending Letters)
- শুনি ও লিখি (Dictation)
- শব্দ ও বাক্য পড়া (Word and Sentence Reading)
- প্রশ্নোত্তর লেখার কাজ:

বর্ণ চিহ্নিতকরণ (Letter Identification)

বর্ণ চিহ্নিতকরণের কাজটি তিনটি ধাপে করা হয়। ধাপ-১ এ শিক্ষক কীভাবে কাজটি করতে হয় তা নিজে আগে করে দেখান। ধাপ-২ এ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কাজটি করেন এবং ধাপ-৩ এ শিক্ষার্থী নিজে নিজে চর্চা করে।

ধাপ-১

শিক্ষক: আজ আমরা যে বর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে ‘ট’ (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন)। এতক্ষণ আমরা যে / ট/ ধ্বনি শিখলাম, তার লিখিত রূপ এরকম। এই বর্ণটি হল ‘ট’।

ধাপ-২

শিক্ষক: এবার আমরা একসাথে বর্ণটি বলব (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: ট।

ধাপ-৩

শিক্ষক: এবার তোমরা এই বর্ণটি বলবে। (শিক্ষক ‘ট’ বর্ণের কার্ড দেখাবেন।) শিক্ষার্থী: ট। শিক্ষক: এবার তোমরা বইয়ের ট বর্ণটি দেখ। এর পাশে একটি ছবি দেওয়া আছে। এটা কীসের ছবি? (শিক্ষক পাশের ছবিটি নির্দেশ করবেন) শিক্ষার্থী: টমেটো। (শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে নাম বলবে) শিক্ষক: টমেটো-এর প্রথম বর্ণ কী? শিক্ষার্থী: ট।

বর্ণ লেখা (Letter Writing)

বর্ণ লেখার কাজটি তিনটি ধাপে করা হয়। ধাপ-১ এ শিক্ষক কীভাবে বর্ণটি লিখতে হয় তা নিজে আগে করে দেখান। ধাপ-২ এ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কাজটি করেন এবং ধাপ-৩ এ শিক্ষার্থী নিজে নিজে ৫ বার বর্ণটি খাতায় লেখার চর্চা করে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং সহায়তা করেন।

ধাপ-১

শিক্ষক: এখন আমি তোমাদের ট বর্ণ লেখা দেখাব। (শিক্ষক ট বর্ণ লেখার নির্দেশনা অনুসরণ করে বোর্ডে বর্ণটি লিখবেন। লেখার সময় তিনি মুখে মুখে বর্ণ লেখার নির্দেশনা ও বর্ণের ধ্বনিটি উচ্চারণ করে লিখবেন)। এই বর্ণটি হচ্ছে ট।

ধাপ-২

শিক্ষক: এবার আমরা একসাথে ‘ট’ বর্ণটি লেখার চর্চা করব। তোমরা তোমাদের বই বের কর। এখানে ট বর্ণটি লেখা আছে। পাশে ট বর্ণ লেখার দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে। আমি বোর্ডে আবার দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে বর্ণটি লেখা দেখাব। তোমরাও আমার সাথে সাথে নির্দেশনাযুক্ত বর্ণটির উপর আঙুল ঘোরাবে এবং বর্ণটির উচ্চারণ বলবে।

ধাপ-৩

শিক্ষক: এবার তোমরা তোমাদের খাতায় ‘ট’ বর্ণটি ৫ বার লেখ। লেখার সময় বর্ণটি মুখে মুখে বলবে। (শিক্ষক ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর লেখা দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

বর্ণের সাথে ছবির মিলকরণ (Blending Letters)

মাঝখানে এ বর্ণটি দেওয়া থাকে। চারপাশে কিছু ছবিও দেওয়া থাকে। যদি ছবির নামের প্রথম ধ্বনি ঐ বর্ণের হয়, তবে তার উপর আঙুল রাখবে। আর না হলে রাখবে না। (শিক্ষক ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর কাছে যাবেন এবং দেখবেন যে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে আঙুল রাখছে কিনা। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।)

বর্ণের/ শব্দাংশের মিলকরণ (Blending Letters)

বর্ণ বা শব্দাংশ মিলকরণ কাজটি তিনটি ধাপে করা হয়। ধাপ-১ এ শিক্ষক কীভাবে কাজটি করতে হয় তা নিজে আগে করে দেখান। ধাপ-২ এ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কাজটি করেন এবং ধাপ-৩ এ শিক্ষার্থী নিজে নিজে চর্চা করে।

ধাপ-১

শিক্ষক: এবার আমরা শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ব। (শিক্ষক বোর্ডে আট লিখবেন এবং শব্দের নিচে আঙুল রেখে পড়বেন) শিক্ষক: আমি পড়ছি তোমরা দেখ, আট (শিক্ষক আঙুল নির্দেশ করে শব্দের অংশ উচ্চারণ করবেন ও শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবেন)

ধাপ-২

শিক্ষক: এবার আমরা একসাথে কাজটি করব। মনে রাখবে, আমি যে অংশে আঙুল নির্দেশ করব তোমরা সেই অংশটুকু উচ্চারণ করবে এবং শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: আট

ধাপ-৩

শিক্ষক: এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে। শিক্ষক: আমি আঙুল নির্দেশ করব তোমরা বলবে। শিক্ষার্থী: আট (এখন শিক্ষক একইভাবে বাকি শব্দগুলো বোর্ডে লিখে ধাপ-২ ও ৩ অনুসরণ করে ছোট শব্দটি পড়াবেন।) শিক্ষক: এখন তোমরা তোমাদের বইয়ের বাকি শব্দগুলো পড়ে তোমার জুটিকে শোনাও। এইভাবে সকল শব্দ পড়বে।

বর্ণ ও চিহ্নের মিলকরণ (Blending Letters)

বর্ণ ও চিহ্নের মিলকরণ কাজটি তিনটি ধাপে করা হয়। ধাপ-১ এ শিক্ষক কীভাবে কাজটি করতে হয় তা নিজে আগে করে দেখান। ধাপ-২ এ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কাজটি করেন এবং ধাপ-৩ এ শিক্ষার্থী নিজে নিজে চর্চা করে।

শিক্ষক বোর্ডে ছক আঁকবেন। প্রথমে শিক্ষক কারচিহ্নটি বর্ণের কোথায় বসে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষক: এখন আমরা দেখব বর্ণের সাথে কারচিহ্ন মিলিয়ে কীভাবে পড়তে হয় - (শিক্ষক বোর্ডে আঁকা ছক থেকে 'ট' এবং আ-কার মিলিয়ে পড়বেন এবং নির্দিষ্ট ঘরে লিখবেন। পড়ার সময় বর্ণ ও কারচিহ্নের উপর আঙুল দিয়ে নির্দেশ করবেন এবং দ্রুত পড়বেন।

শিক্ষক তখন ৪-৫ জনের কাছে গিয়ে পড়া শুনবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

শব্দ ও বাক্য পড়া (Word and Sentence Reading)

শব্দ ও বাক্য অর্থাৎ অনুচ্ছেদ পড়ার কাজটি দুটি ধাপে করা হয়। বর্ণের প্রথম দিনের পাঠে ধাপ-১ এ শিক্ষার্থীরা নিজেরা আগে অনুচ্ছেদটি আঙুল নির্দেশ করে পড়ে। ধাপ-২ এ অনুচ্ছেদটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসাথে পড়ে অর্থাৎ শিক্ষক পড়বে শিক্ষার্থীরা আঙুল মিলিয়ে শিক্ষকের পরপর পড়বে। আবার বর্ণের দ্বিতীয় দিনের পাঠে ধাপ-১ এ শিক্ষক আগে অনুচ্ছেদটি পড়ে শোনাবে শিক্ষার্থীরা শুনবে ও আঙুল মেলাবে। ধাপ-২ এ শিক্ষার্থীরা নিজেরা অনুচ্ছেদটি পড়বে। প্রয়োজনে শিক্ষক

ধাপ-১:

শিক্ষক: তোমরা তোমাদের বইয়ের পৃষ্ঠা-... খুলে অনুচ্ছেদটি আঙুল নির্দেশ করে পড়। (শিক্ষক নির্দিষ্ট ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর কাছে যাবেন, পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।)

ধাপ-২:

শিক্ষক: এবার আমরা সবাই একসঙ্গে অনুচ্ছেদটি পড়ব। পড়ার সময় তোমরা বইয়ে আঙুল মেলাবে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী: (শিক্ষক একসাথে ২/৩ লাইন করে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে।

(শিক্ষক নির্দিষ্ট ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর কাছে যাবেন, পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

সহায়তা করবেন।

লেখার কাজ:

আপনি যখন আপনার শিক্ষার্থীকে ভালো লেখক বানাতে চেষ্টা করবেন, তখন আপনি তাকে একজন ভালো পাঠক হিসেবেও তৈরি করছেন!

লেখা শিশুর বানান দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়, লেখার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। পড়ার সাংকেতিক চিহ্নগুলোর সাথে পরিচিত হতে পার এবং তা মনে রাখার ক্ষেত্রে লেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। লেখার কাজের ফলে শিশুর শব্দের সাথে পরিচিতি ঘটে।

- বর্ণ/কার-চিহ্ন লেখা
- প্রশ্নের উত্তর লেখা
- শুনি ও লিখি।

বর্ণ লেখার কাজ:

বর্ণ লেখার কাজটি তিনটি ধাপে করা হয়। ধাপ-১ এ শিক্ষক কীভাবে বর্ণটি লিখতে হয় তা নিজে আগে করে দেখান। ধাপ-২ এ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কাজটি করেন এবং ধাপ-৩ এ শিক্ষার্থী নিজে নিজে ৫ বার বর্ণটি খাতায় লেখার চর্চা করে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং সহায়তা করেন।

ধাপ-১

শিক্ষক: এখন আমি তোমাদের ট বর্ণ লেখা দেখাব। (শিক্ষক ট বর্ণ লেখার নির্দেশনা অনুসরণ করে বোর্ডে বর্ণটি লিখবেন। লেখার সময় তিনি মুখে মুখে বর্ণ লেখার নির্দেশনা ও বর্ণের ধ্বনিটি উচ্চারণ করে লিখবেন)। এই বর্ণটি হচ্ছে ট।

ধাপ-২

শিক্ষক: এবার আমরা একসঙ্গে 'ট' বর্ণটি লেখার চর্চা করব। তোমরা তোমাদের বইবের কর। এখানে ট বর্ণটি লেখা আছে। পাশে ট বর্ণ লেখার দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে। আমি বোর্ডে আবার দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে বর্ণটি লেখা দেখাব। তোমরাও আমার সাথে সাথে নির্দেশনাযুক্ত বর্ণটির উপর আঙুল ঘোরাবে এবং বর্ণটির উচ্চারণ বলবে।

ধাপ-৩

শিক্ষক: এবার তোমরা তোমাদের খাতায় 'ট' বর্ণটি ৫ বার লেখ। লেখার সময় বর্ণটি মুখে মুখে বলবে। (শিক্ষক ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর লেখা দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

শুনি ও লিখি (Dictation)

শুনি ও লিখির কাজটি দুটি ধাপে করা হয়। ধাপ-১ এ শিক্ষক কাজটি আগে নিজে করে দেখান। ধাপ-২ এ শিক্ষক বলবেন শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে খাতায় বর্ণ/শব্দাংশ লিখে।

ধাপ-১:

এবার আমরা শুনে শুনে লেখার কাজ করব। আমি একটি করে দেখাচ্ছি। প্রথমে লিখব ট। (শিক্ষক মুখে ট বলবেন এবং বোর্ডে ট লিখবেন)।

ধাপ-২

এখন আমি আরও কিছু বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলব। তোমরা তোমাদের খাতায় লিখবে। (শিক্ষক ধীরে ধীরে একটি একটি করে বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের লেখা দেখবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দগুলো হলো- ট, ঘৃ, টাকা।

প্রারম্ভিক স্তরের শিশুদের পড়া শেখানোর ক্ষেত্রে গবেষণাভিত্তিক পাঁচটি উপাদান ধ্বনি সচেতনতা, ফোনিক্স, শব্দভাণ্ডার, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা – একটি সুসংহত কাঠামো হিসেবে কাজ করে। এই উপাদানগুলোকে পাঠ্যক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষ অনুশীলনে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করলে শিশুরা শুধু পড়তে শেখে না, বরং দক্ষতা, আগ্রহ এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্বাধীন পাঠকে পরিণত হয়।

শব্দভাণ্ডার

সঠিক ও অর্থপূর্ণভাবে ভাষা ব্যবহার করার জন্য সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর শব্দভাণ্ডার অর্জনের বিষয়টি একটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ, শব্দের আভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থ, শব্দের বানান এবং শব্দটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারার দক্ষতাকে নির্দেশ করে। পড়া ও লেখার জন্য শব্দভাণ্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার উন্নয়নের জন্য প্রাত্যহিক আলাপচারিতার মধ্যে নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন গল্প পঠনের মাধ্যমে শিশুদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত নির্ধারিত নতুন নতুন শব্দ চর্চার সুযোগ শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা অধিক কার্যকরভাবে ব্যবহার করার সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

এই পাঁচ উপাদানের মধ্যে শব্দভাণ্ডার সরাসরি পাঠ্যবস্তু বোঝার সাথে যুক্ত। শব্দভাণ্ডার হলো এমন একগুচ্ছ অর্থবোধক শব্দ যার অর্থ শিশুরা জানে এবং যেগুলো বাক্য বা গল্পে ব্যবহৃত হলে তা বুঝতে সক্ষম হয়। একজন পাঠক যখন শব্দ চিনতে পারে, ডিকোড করতে পারে এবং তার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারে, তখনই সে প্রকৃত অর্থে পাঠোদ্ধার করতে পারে। তাই দৈনন্দিন কথোপকথনে পাওয়া যায় না—এমন নতুন, জটিল ও অপরিচিত শব্দগুলো পরিকল্পিতভাবে শেখানো শিক্ষার অপরিহার্য অংশ।

গবেষণা দেখায় যে, পাঠ বোধগম্যতা অনেকাংশেই নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শব্দভাণ্ডারের পরিমাণ ও গুণমানের উপর। অপরিচিত শব্দ একটি পাঠ্যাংশকে পুরোপুরি অর্থহীন করে তুলতে পারে, আর পরিচিত শব্দ একই পাঠকে সহজবোধ্য ও উপভোগ্য করে। এজন্য শ্রেণিকক্ষে প্রতিদিন দুটি নতুন শব্দের সঠিক উচ্চারণ, অর্থ এবং বাক্যে প্রয়োগ শেখানো শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির কার্যকর পদ্ধতি।

শিক্ষক যদি গল্প পড়ানোর আগে নতুন শব্দ পরিচিত করান এবং ধাপে ধাপে মডেলিং, সহযোগী অনুশীলন ও শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র প্রয়োগের সুযোগ দেন, তাহলে শিশুরা শুধু শব্দই শেখে না-পাঠকে অর্থপূর্ণভাবে বুঝতে শেখে। পাঁচটি পঠন উপাদানের সাথে শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে শিশুরা আত্মবিশ্বাসী, সাবলীল ও দক্ষ পাঠক হিসেবে গড়ে ওঠে।

শব্দভাণ্ডার কী?

শব্দভাণ্ডার হচ্ছে একগুচ্ছ অর্থবোধক শব্দ যা বাক্যের অর্থ বুঝতে সহায়তা করে।

পঠনের একটি উপাদান হলো শব্দভাণ্ডার । শব্দভাণ্ডার হলো এমন এক সেট শব্দ, যার অর্থ আপনি বোঝেন।

প্রাথমিকভাবে শিশুরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক নতুন নতুন শব্দ শিখে। বড় হয়েও, আমরা নতুন শব্দ শিখতে পারি। কিন্তু শিশু বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে নতুন কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হয়। যে শব্দগুলো তাকে শেখানোর দরকার হয়। যেমন- প্রথম শ্রেণির আমার বাংলা বইয়ের শুরুর দিকে একটি শব্দ অজ। যে শব্দটা আমরা সচারচর বাড়িতে ব্যবহার করি না। তাই এই শব্দের অর্থ পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। শব্দভাণ্ডার শেখানো দরকার বিশেষ করে যখন এটি বেশি জটিল বা অপরিচিত শব্দ হয়। আমরা যখন শব্দ শেখাই, তখন সেসব শব্দ শেখানোর উপরে জোর দেই যেগুলো শিশুরা সাধারনত দৈনন্দিন জীবনে শেখে না,কথোপকথনে শোনে না। তবে এরকম শব্দ আমরা পাঠ্যবইয়ে প্রায়ই পড়ি এবং এই শব্দগুলোই শেখাতে হবে।

একজন সার্থক পাঠক হতে হলে শব্দকে ডিকোড করতে পারতে হবে এবং তার অর্থ বুঝতে পারতে হবে।

আর অর্থ বুঝতে হলে শিক্ষার্থীর ভাণ্ডারে শব্দটি থাকতে হবে। শিশুরা সাধারণভাবে যে সকল শব্দ শিখে স্কুলে আসে, তা পর্যাপ্ত নয়। তাই পরিকল্পিতভাবে শিশুদের শব্দভাণ্ডার শিক্ষণ পড়ায় ভালো ফলাফল বয়ে আনে।

কোনো পাঠ বোধগম্য হতে হলে সেই পাঠে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝতে হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বোধগম্যতা নির্ভর করে শব্দের অর্থ বুঝতে পারার ওপর। যার শব্দভাণ্ডার যত বেশি তার বোধগম্যতাও তত বেশি।

কোনো গল্প ভালোভাবে বুঝতে হলে গল্পে ব্যবহৃত নতুন শব্দের অর্থ জানা থাকতে হবে। এছাড়াও সফল পাঠক হতে হলে, শিশুদের শব্দের পাঠোদ্ধার করতে ও অর্থ বুঝতে হবে। অর্থ বোঝার জন্য, শব্দগুলো অবশ্যই শিশুদের শব্দভাণ্ডারে থাকতে হবে। শিশুরা যখন কোনো গল্প শোনে তখন তারা নতুন নতুন অনেক শব্দের সাথে পরিচিত হয়। কিন্তু সেগুলোর অর্থ জানা না থাকায় বার বার প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানতে চায়।

নতুন শোনা শব্দের অর্থ জানতে না পারলে তা তাদের কাছে অর্থহীন আওয়াজ বা ধ্বনি হিসাবে থেকে যায়। তাই প্রতিদিনই পরিকল্পনা মাফিক কিছু কিছু শব্দ শিশুদের শেখাতে হয়। এই শেখানোর কাজটা গল্প পড়ার আগে দুটো নতুন শব্দ শেখানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। গল্প শোনানোর মাঝে তা ঘটলে তাতে গল্প শোনার বা বলার মজা কমে আসে।

শব্দভাণ্ডার কেন প্রয়োজন তা বোঝার জন্য চলুন আমরা একটি অনুচ্ছেদ পড়ি-

> ট্রেগনেল্ট জেড হচ্ছে একধরনের জেড যা দিয়ে যেকোনো জায়গা থেকে জেড করা যায়। সাধারণ জেড থেকে ট্রেগনেল্ট জেড একটু আলাদা। ট্রেগনেল্ট জেড-এ আলাদাভাবে ওয়াক্র দিয়ে সংযোগের প্রয়োজন নেই। ট্রেগনেল্ট জেড বর্তমানে খুবই ছোট আর হালকা। ১৯৭৩ সালে তৈরি প্রথম ট্রেগনেল্ট জেড ছিল ১ কেজি ওজনের।

আমরা অনুচ্ছেদটি ডিকোড করতে পেরেছি, কিন্তু এর অর্থ বুঝতে পেরেছি কি? আমরা একটু চিন্তা করি তো কেন এর অর্থ বুঝতে পারিনি?

চলুন অনুচ্ছেদটি আবার পড়ি-

> মোবাইল টেলিফোন হচ্ছে একধরনের টেলিফোন যা দিয়ে যেকোনো জায়গা থেকে টেলিফোন করা যায়। সাধারণ টেলিফোন থেকে মোবাইল টেলিফোন একটু আলাদা। মোবাইল টেলিফোন-এ আলাদাভাবে তার দিয়ে সংযোগের প্রয়োজন নেই। মোবাইল টেলিফোন বর্তমানে খুবই ছোট আর হালকা। ১৯৭৩ সালে তৈরি প্রথম মোবাইল টেলিফোন ছিল ১ কেজি ওজনের।

এবার নিশ্চয়ই অনুচ্ছেদটির অর্থ বুঝতে পেরেছেন।

আমরা আগের অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারিনি কারণ এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি শব্দ আছে, যেমন- ট্রেগনেল্ট, জেড, ওয়াক্র-এর অর্থ কী হবে তা আমাদের অজানা ছিল। কিন্তু পরের অনুচ্ছেদটি আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছি। কারণ এখন সব শব্দগুলো তাদের পরিচিত। কয়েকটি মাত্র শব্দের জন্য আমরা আগের পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি।

একারণেই পাঠকে বোধগম্য করার জন্য শব্দভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা অসীম।

শব্দভাণ্ডার শিখনে প্রতিদিন দুটি করে শব্দ শেখাতে হবে। কোন দিন কোন কোন শব্দ শেখাতে হবে তা শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লেখ করা আছে।

শব্দভাণ্ডারের কাজসমূহ

১. শব্দটির স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ শেখানো

২. শব্দটির অর্থ শেখানো

৩. নতুন শব্দটি সঠিকভাবে বাক্যে ব্যবহার করতে শেখানো

শব্দভাণ্ডারে যেসকল শব্দ শেখানো হবে যাতে থাকবে-

- সঠিক উচ্চারণে শব্দটি বলা
- শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে দেয়া
- শব্দটি ব্যবহার করে বাক্য গঠন
- শিক্ষার্থীদের নতুন বাক্য গঠন করতে বলা

শব্দভাণ্ডার শেখানোর জন্য শিক্ষক প্রথমে গল্পটি থেকে শব্দ নির্বাচন করবেন। এরপর ক্লাসে গল্পটি পড়ানোর আগে শব্দটির সাথে পরিচিত করাবেন। প্রথমে নিজে করবেন, এরপর শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে করবেন, শেষে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের সুযোগ দিবেন।

তিনটি ধাপে তিনি কাজটি করবেন-

ধাপ-১

শিক্ষক: এখন আমি তোমাদের একটি গল্প পড়ে শোনাব। তবে তার আগে আমরা দুটো শব্দ শিখব।

প্রথম শব্দটি হলো - হাজির। (ছবি থাকলে তা দেখাবেন) হাজির শব্দটির অর্থ হলো উপস্থিত (শিক্ষক নিজের মতো করে অর্থটি বুঝিয়ে দিবেন)।

এখন আমি এই শব্দটি দিয়ে একটি বাক্য বলছি। হাজির দিয়ে বাক্যটি হলো - মিতু ডাকতেই তোতা হাজির হলো।

ধাপ-২

শিক্ষক: এবার আমরা একসঙ্গে শব্দটি বলব। শব্দটি হলো- হাজির (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসাথে বলবে)।

শিক্ষক: আমরা একসঙ্গে শব্দটির অর্থ বলব।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: হাজির শব্দের অর্থ হলো- উপস্থিত।

শিক্ষক: এবার আমরা হাজির দিয়ে আরেকটি বাক্য বলব। (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি নতুন বাক্য বলতে সহায়তা করবেন অথবা নিচের বাক্যটি ব্যবহার করতে পারেন।)

মিতু ডাকতেই তোতা হাজির হলো।

ধাপ-৩

শিক্ষক: এবার তোমরা জুটিতে এই বাক্যগুলো বলো। যদি পার, আরো নতুন নতুন বাক্য তৈরি কর।

(শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের বাক্য শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে ৪-৫ জন শিক্ষার্থী সকলের উদ্দেশে তাদের বাক্যগুলো বলবে। শিক্ষার্থী বলতে না পারলে প্রয়োজনে নিচের বাক্যটি ব্যবহার করবেন।)

রাতে মামা বাসায় হাজির হলেন।

শিক্ষক একই প্রক্রিয়ায় ঊর্মি শব্দটি নিয়ে কাজ করবেন।

ঊর্মি অর্থ ঢেউ।

বাক্য হলো - সাগরের ঊর্মিতে জাহাজ ভেসে বেড়ায়। হাঁস ঊর্মিতে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

এভাবে শিক্ষক তিনটি ধাপের মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিতভাবে দুটো শব্দের উচ্চারণ, অর্থ এবং বাক্যে ব্যবহার শেখাবেন।

প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা উন্নয়নে পাঁচটি মূল উপাদান – ধ্বনি সচেতনতা, ফোনিক্স, শব্দভাণ্ডার, পঠন সাবলীলতা এবং বোধগম্যতাসমন্বিতভাবে চর্চা করা অত্যন্ত জরুরি। এর মধ্যে শব্দভাণ্ডার এমন একটি উপাদান যা পড়ার অর্থ অনুধাবন, নতুন ধারণা গ্রহণ এবং পাঠে আনন্দ বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ শব্দের অর্থ জানা না থাকলে কোনো পাঠই বোধগম্য হয় না, আর অর্থ জানলেই একই পাঠ শিক্ষার্থীর কাছে জীবন্ত ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

পরিকল্পিতভাবে প্রতিদিন নতুন শব্দ শেখানো, তার উচ্চারণ ও অর্থ স্পষ্ট করা এবং বাক্যে প্রয়োগ করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। শিক্ষক যখন মডেলিং, সহযোগী অনুশীলন এবং স্বতন্ত্র চর্চার সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তখন শিক্ষার্থীরা শুধু শব্দ নয় – সম্পূর্ণ পাঠটিই আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়।

সমন্বিতভাবে পাঁচটি পঠন উপাদান চর্চা এবং শব্দভাণ্ডারকে শিক্ষণের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করলে প্রারম্ভিক স্তরের শিশুরা দক্ষ, সাবলীল ও স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে উঠবে। এভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরও দৃঢ় হবে।

পঠন সাবলীলতা

পঠন সাবলীলতা হলো কোনো একটি পাঠ বা পাঠ্যাংশ নির্দিষ্ট মান গতিতে, সঠিক উচ্চারণে এবং অভিব্যক্তির মাধ্যমে পড়তে পারার দক্ষতা। অর্থাৎ কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, সঠিক উচ্চারণে ও সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারার দক্ষতাই পঠন সাবলীলতা।

পঠন সাবলীলতায় কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, সঠিক উচ্চারণে ও সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারতে হয়।

পড়ার দুটো অংশ...

- পাঠোদ্ধার বা ডিকোডিং
- বোধগম্যতা বা পঠিত অংশের অর্থ বুঝতে পারা

সমস্বরে পড়ার সময় কোথাও তাড়াতাড়ি, কোথাও আস্তে, কোথাও জোর দিয়ে, কোথাও আবার একটু থেমে, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গি অনুসরণ করে অর্থাৎ সঠিক যতিচিহ্নের ব্যবহার জেনে সাবলীলভাবে পড়তে হয়। সাবলীলভাবে পড়তে না পারলে শিশু পঠিত অংশের অর্থ বুঝতে পারবে না।

সাবলীলতার বৈশিষ্ট্য

- সঠিক গতিতে পড়তে পারা
- সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারা
- বিরামচিহ্ন মেনে যথাযথ নিয়মানুযায়ী পড়তে পারা
- সঠিক স্বরভঙ্গি ও স্বরাঘাত বজায় রেখে পড়তে পারা

পঠন সাবলীলতার গুরুত্ব

পড়ার দুটো অংশ আছে একটি হলো শব্দকে ডিকোড করতে পারা আরেকটি হলো ডিকোডকৃত শব্দের অর্থ বুঝতে পারা।
কম সাবলীল পাঠক একটি একটি করে শব্দ শনাক্ত করে এবং খুব ধীরে ধীরে পড়ে, নিজে নিজে ভুল সংশোধন করতে পারেনা, খুব কম ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে, মনে হয়না যে পড়ে অর্থ বুঝতে পারছে বিরামচিহ্নের ব্যবহার করতে পারে না, খুব অল্পতেই পরিশ্রান্ত হয়ে যায় ফলে যা পড়ে তা বুঝতে পারে না।

অপরদিকে, সাবলীল পাঠক, দ্রুত অর্থ শনাক্ত করে এবং বাধাহীনভাবে পড়ে, একটা মান গতি বজায় রাখে, নিজে নিজে ভুল সংশোধন করতে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে, মনে হয় যে পড়ে অর্থ বুঝতে পারছে, বিরামচিহ্নের ব্যবহার করতে পারে, দেখে মনে হয়না যে পরিশ্রান্ত হয়েছে ফলে যা পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারে।
কম সাবলীল পাঠক তাঁর বেশিরভাগ সময়, শ্রম এবং মনোযোগ শুধুমাত্র ডিকোডের পেছনেই ব্যয় করে ফেলে। যার ফলে কোন কিছু পড়ার পর সে কী পড়েছিল তা মনে করতে পারে না, ফলে সে বুঝতে পারে না।
অপরদিকে সাধারণভাবে যে শিশু দ্রুত পড়ে সে কী পড়েছিল তা বুঝতে পারে। এছাড়াও শিশুদের গল্প শোনানোর ক্ষেত্রে সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে মানগতি সহকারে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে গল্প পড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা সঠিক স্বরভঙ্গির মাধ্যমে গল্প না পড়লে শিশুদের কাছে গল্পের আকর্ষণ কমে যায়।
পঠন সাবলীলতা কেন প্রয়োজন?

- কম সাবলীল পাঠক তাঁর বেশিরভাগ সময়, শ্রম এবং মনোযোগ শুধুমাত্র শব্দ শনাক্তকরণের পেছনেই ব্যয় করে ফেলে
- যার ফলে কোনো কিছু পড়ার পড়ে সে কী পড়েছিল তা মনে করতে পারেনা
- সে বুঝতে পারেনা যে, সে কী পড়েছিল

সাধারণভাবে সাবলীল পাঠক বুঝতে পারে যে সে কী পড়েছিল।

এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় পাঠের বোধগম্যতার জন্য সাবলীলতা গুরুত্বপূর্ণ।

কম সাবলীল পাঠক এবং সাবলীল পাঠকের বৈশিষ্ট্য

কম সাবলীল পাঠক	সাবলীল পাঠক
• একটি একটি করে শব্দ শনাক্ত করে খুব ধীরে ধীরে পড়ে। • নিজে নিজে ভুল সংশোধন করতে পারে না • খুব কম ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে। অর্থাৎ মনে হয় না যে পড়ে সে অর্থ বুঝতে পারছে। • বিরামচিহ্নের ব্যবহার করে পড়তে পারে না এবং খুব অল্পতেই পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। • বেশিরভাগ সময়, শ্রম এবং মনোযোগ শুধুমাত্র শব্দ ডিকোডের পেছনেই ব্যয় করে। যার ফলে কোন কিছু পড়ার পর সে কী পড়েছিল তা মনে করতে পারে না। এর ফলে সে যা পড়ছে তা বুঝতে পারে না।	• অর্থ শনাক্ত করে বাধাহীনভাবে পড়ে। • একটা নির্দিষ্ট মানগতি বজায় রেখে পড়ে। • অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে এবং মনে হয় যে পড়ে অর্থ বুঝতে পারছে। • বিরামচিহ্নের ব্যবহার করে পড়তে পারে এবং তার অর্থ বুঝতে পারে। • নিজে নিজে ভুল সংশোধন করেও পড়তে পারে

পঠন সাবলীলতার চর্চা

পঠন সাবলীলতা অর্জনের জন্য এর চর্চা খুবই প্রয়োজন। চর্চা আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন শিক্ষক ফিডব্যাক দেন এবং শিক্ষার্থীদের নানা পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেন। বারবার পঠন সাবলীলতার চর্চা শিক্ষার্থীদের পড়ার শুদ্ধতা, মানগতি আনা এবং পাঠের অর্থ উদ্ধারের দক্ষতা বাড়ায়

শব্দ পঠন সাবলীলতা

শিক্ষার্থীরা গল্প বা অনুচ্ছেদ পড়ার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ শব্দ জানার আগ পর্যন্ত বর্ণ, শব্দাংশ বা শব্দ দিয়ে পঠন সাবলীলতার চর্চা করতে পারে।

শব্দ পঠন সাবলীলতা কেন প্রয়োজন?

- শব্দ পড়ার চর্চা শিক্ষার্থীদেরকে সাবলীলভাবে শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ পড়তে সহায়তা করে;
- যখন শিক্ষার্থীরা শব্দকে আলাদাভাবে চিনতে পারে তখন তারা খুব সহজেই এগুলোকে জোড়া লাগাতে পারে এবং শব্দগুলোকে পড়তে পারে;
- যখন শিক্ষার্থী সহজে শব্দ শনাক্ত করতে পারে তখন সে শব্দ পড়তে কম সময় ব্যয় করে এবং অর্থ উদ্ধারে বেশি সময় ব্যয় করে।

শব্দ পঠন সাবলীলতা চর্চা

- শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহার করুন;
- আমি করি- আমরা করি-তুমি কর পদ্ধতি অনুসরণ করুন;
- শিক্ষার্থীরা সাবলীল ও শুদ্ধভাবে শব্দ পড়ছে কি না, তা লক্ষ করুন (বানান করে যেন না পড়ে);
- বারবার পড়া শিক্ষার্থীকে সাবলীলভাবে পড়তে সহায়তা করছে কি না, তা লক্ষ করুন;
- মনিটর করুন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

অনুচ্ছেদ বা গল্প পড়া

- প্রারম্ভিক পর্যায়ে গল্পে সেই বর্ণগুলোই কেবল ব্যবহার করা হয় যেগুলো শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে শিখে নিয়েছে;
- অনুচ্ছেদের সবগুলো শব্দ শিক্ষার্থীরা শনাক্ত করতে পারে এবং উচ্চারণ করতে পারে;
- এটা শিক্ষার্থীদেরকে বাধাহীনভাবে অনুচ্ছেদটি পড়তে সাহায্য করে। প্রতিটা শব্দ আলাদাভাবে শনাক্ত করতে তার সময় ব্যয় করতে হয়না। ফলে শিক্ষার্থীরা একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে তার পূর্বে শেখা শব্দগুলোকে জোড়া লাগিয়ে গল্প আকারে পড়তে পারে।

অনুচ্ছেদ/গল্প পড়া কেন প্রয়োজন?

কানেকটেড টেক্সট বলতে বাক্যের মধ্যের শব্দগুলোর সম্পর্ককে বোঝায় (যেমন একটি গল্প বা অনুচ্ছেদ)। এটা আলাদা আলাদা শব্দ বা একটা শব্দ তালিকা বা একনাগাড়ে অনেকগুলো শব্দ নয়। শিক্ষার্থীদেরকে অনুচ্ছেদের মধ্যের শব্দ পড়ার চর্চা করা জরুরি। কারণ-

- কানেকটেড টেক্সট শিক্ষার্থীকে শব্দ পড়তে এবং শব্দ মিলে তৈরি বাক্য পড়ে বুঝতে সাহায্য করে;
- ডিকোডেবল টেক্সট শিক্ষার্থীকে প্রথম সত্যিকার অর্থে পড়তে পারার একটি সফল অভিজ্ঞতা দেয়।

অনুচ্ছেদ বা গল্প চর্চা

কানেকটেড টেক্সট শিক্ষার্থীদেরকে নিচের বিষয়গুলো চর্চা করতে সাহায্য করে –

- শব্দ পড়া
- বিচ্ছিন্ন শব্দগুলো বাক্যে বা অনুচ্ছেদে একসাথে পড়ার ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করে
- বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে পড়া
- ডিকোডেবল গল্প শিক্ষার্থীদেরকে একটি ভালো অভিজ্ঞতা ও আত্নবিশ্বাস তৈরি করে ফলে পরে তারা পাঠ্যবই ও গল্প পড়তে উৎসাহিত হয়

যিনি সাবলীলতাভাবে পড়তে পারেন না, তিনি পড়তে গেলে অনেক বেশি সময়, শক্তি আর মনোযোগ ব্যয় করেন শুধুমাত্র শব্দকে ভাঙতে। ফলে তিনি কী পড়েছেন, তা মনে রাখতে পারেন না। একারণে তিনি কী পড়েছেন, তা বুঝতে পারেন না।

সচরাচর, যাদের পঠন সাবলীলতা আছে তারা কী পড়েছে বুঝতে পারে।

পঠন সাবলীলতায় তিনটি কাজ

১. বইয়ের ছবির সাথে পরিচিত করানো

২. গল্পটি কী নিয়ে হতে পারে তা জানতে চাওয়া

৩. গল্পটি মান, গতি, শুদ্ধতা ও অভিব্যক্তির সাথে পড়া

পঠন সাবলীলতা অংশে শিক্ষক পাঠে ব্যবহৃত ছবিটি দেখাবেন। ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে তা জানতে চাইবেন। গল্পটি কী নিয়ে হতে পারে তা জানতে চাইবেন। এরপর গল্পটি মান, গতি, শুদ্ধতা ও অভিব্যক্তির সাথে পড়বে।

আমরা এখন একটি পাঠকে কেন্দ্র করে বিষয়টির অনুশীলনী করব-
(শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠা-..... এর ছবিটি দেখতে বলবেন।)
শিক্ষক: আমরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছি? (শিক্ষক ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন)।
শিক্ষক: এই গল্পের নাম হলো '..............'। তোমরা কি বলতে পার গল্পটি কী নিয়ে হতে পারে? (শিক্ষক ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন)।
শিক্ষক: এবার আমি গল্পটি তোমাদের পড়ে শোনাব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। (শিক্ষক সঠিক গতি এবং অঙ্গাভঙ্গি সহকারে গল্পটি পড়বেন।)
এভাবে শিক্ষক গল্পটি সঠিক গতি এবং অঙ্গাভঙ্গি সহকারে পাঠ করবেন। শিক্ষার্থী যাতে বুঝতে পারে সেই দিকে খেয়াল রাখবেন।

শব্দভান্ডার শিক্ষার্থীর পাঠ বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সাবলীলতা তার পড়াকে স্বচ্ছ, ধারাবাহিক ও অর্থকেন্দ্রিক করে। একটি কম সাবলীল পাঠক যেখানে প্রায় পুরো শক্তি ডিকোডিংয়ে ব্যয় করে, সেখানে সাবলীল পাঠক সহজে শব্দ শনাক্ত করে অর্থের দিকে মনোযোগ দিতে পারে – ফলে সে যা পড়ে তা বুঝতে সক্ষম হয়।
শিক্ষক যদি পরিকল্পিতভাবে শব্দভান্ডার শেখানো, সঠিক স্বরভঙ্গিতে গল্প পড়ানো, পাঠ-পূর্ব শব্দ পরিচিতি, সহযোগী অনুশীলন এবং স্বতন্ত্র চর্চার সুযোগ নিশ্চিত করেন, তাহলে শিশুরা শুধু পড়তে নয় অর্থসহকারে বুঝে পড়তে শিখবে।

বোধগম্যতা

একজন দক্ষ পাঠক হিসেবে গড়ে উঠতে হলে শিশুদের পড়ার পাঁচটি উপাদান-ধ্বনি সচেতনতা, ফোনিক্স, শব্দভান্ডার, পঠন সাবলীলতা এবং বোধগম্যতা পরিকল্পিতভাবে শেখানো অপরিহার্য।

এই পাঁচটি উপাদানের মধ্যে বোধগম্যতা হলো পঠনের মূল উদ্দেশ্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বোধগম্যতা মানে হলো- কোনো লেখা পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা। শিশুরা যখন পাঠ্যাংশে থাকা তথ্য, ধারণা ও বার্তাগুলোকে অর্থপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারে, তখনই তাদের বোধগম্যতা অর্জিত হয়েছে বলা যায়। বোধগম্যতা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থীদের শুধু শব্দ উচ্চারণ নয়—বরং তথ্য খেয়াল করা, মূল বক্তব্য খুঁজে বের করা, প্রশ্নের উত্তর তৈরি করা, পূর্বজ্ঞান সক্রিয় করা এবং পাঠ থেকে অর্থ বের করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল শিখতে হয়।

শিশুরা অনেক সময় অনুচ্ছেদ পড়তে পারলেও সে সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এর কারণ তারা শুধুই 'ডিকোড' করতে পারে, কিন্তু বুঝে পড়তে পারে না। ডিকোডিংয়ের জন্য প্রয়োজন ধ্বনি সচেতনতা ও ফোনিক্স, আর বোধগম্যতার জন্য প্রয়োজন সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার, শুদ্ধ উচ্চারণ, মান গতি, সাবলীলতা এবং পাঠ্যাংশের অর্থ অনুধাবনের ক্ষমতা। তাই পাঁচটি পঠন উপাদানের মধ্যে বোধগম্যতা পাঠের আসল লক্ষ্য পূরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বোধগম্যতা কী?

পঠনের একটি উপাদান হলো বোধগম্যতা। বোধগম্যতা হলো কোনো টেক্সট পড়ে তা বুঝতে পারা। শিশুদের পাঠের বোধগম্যতা হয়েছে মানে হলো তারা যা পড়েছে তা বুঝতে পেরেছে। তথ্য বুঝতে পারার মাধ্যমে শিশু পাঠ বুঝতে পারবে। তাই পড়া বা শোনার সময় শিশুদের তথ্য খেয়াল করার অনুশীলন করতে হবে। টেক্সট ভালো ভাবে বোঝার জন্য কিছু কৌশল শিশুদের শেখাতে হবে।

পড়ার দক্ষতার জন্য সঠিক গতি, যথাযথ উচ্চারণ, উপযুক্ত স্বরভঙ্গি ইত্যাদি যথেষ্ট নয়, বরং পড়ার দক্ষতার সাথে পাঠের অর্থোদ্ধার করার ক্ষমতা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা অর্জনের জন্য পড়ার বিভিন্ন পর্যায়ে (পূর্বে, মাঝে ও পরে) বিভিন্ন অনুশীলন সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন, কোনো গল্প পাঠের আগে গল্পটি সম্পর্কে শিশুকে পূর্বেই কিছু নির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করে, গল্পের মাঝে প্রদত্ত তথ্যের অবস্থান শনাক্ত করতে দেওয়া, গল্পের পরে গল্প সম্পর্কে শিশুর অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া ইত্যাদি।

পঠন বোধগম্যতার জন্য দরকার হলো বুঝে পড়তে পারা। যেসকল শিক্ষার্থী বুঝে পড়তে পারে সেসকল শিক্ষার্থী সেই অনুচ্ছেদ থেকে যেকোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

আমরা কোনো বিষয় পড়ি সেই বিষয়টি বুঝতে পারার জন্যেই। পড়ার উদ্দেশ্য শুধু ডিকোড করতে পারাই না ডিকোটকৃত বিষয়টি বুঝতে পারাও এর উদ্দেশ্য। ডিকোডকৃত বিষয় বুঝতে না পারলে পড়ার উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না।

কোনো কিছু পড়ে বুঝতে পারাই হলো বোধগম্যতা। পঠন বোধগম্যতার জন্য দরকার হলো পঠনকৃত বিষয়টি বুঝে পড়তে পারা। যেসকল শিক্ষার্থী বুঝে পড়তে পারে সে সকল শিক্ষাথী সেই অনুচ্ছেদ থেকে যেকোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

পঠনের মূল লক্ষ্য হলো আপনি যা পড়েন তা বুঝতে পারা। কোনো কিছু পড়ে যদি তার অর্থ নাই বুঝতে পারেন তাহলে সেই পড়ার মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। তাই পঠনে বোধগম্যতা বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

আমরা অনেক সময় দেখতে পাই শিক্ষার্থীরা রিডিং পড়তে পারছে, কিন্তু পাঠ থেকে কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারছে না। এটা হয়ে থাকে বোধগম্যতা না থাকার ফলে। পড়ার দুইটি অংশ থাকে, একটি হলো- ডিকোড করতে পারা। এরজন্য

দরকার হয় ধ্বনি সচেতনতা এবং ফোনিক্স-এর। আরেকটা হলো-বুঝতে পারা, এরজন্য দরকার হয় সমৃদ্ধ শব্দভান্ডার, মান, গতি, শুদ্ধতা ও অভিব্যক্তির সাথে পড়া এবং পঠনকৃত বিষয়টি বুঝতে পারা বা বোধগম্য হওয়া। আর পাঠ বোধগম্য হওয়া মানেই পড়ার উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া।

তাই বোধগম্যতা পঠনের উপাদানের মধ্যে বেশি গুরুত্ব বহন করে। 'বোধগম্যতা' হলো কেবল কিছু পড়ে বুঝতে পারা। পড়ার আসল উদ্দেশ্য হলো পঠিত বিষয়ের অর্থ উদ্ধার করা বা বোঝা। পড়ার দুইটি অংশ থাকে: ১। পাঠোদ্ধার (Decoding)২। বোধগম্যতা (Understanding)।সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসেবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারাকেই বলে পাঠোদ্ধার এবং পুরো লেখাটির অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে বুঝতে পারাই হলো বোধগম্যতা এই দুইটি অংশের মধ্যে বোধগম্যতাই হচ্ছে পড়ার মূল উদ্দেশ্য। যে সকল শিক্ষার্থী বুঝে পড়তে পারে তারা পড়ে যেমন- আনন্দ পায় তেমনি সেই পঠিত অনুচ্ছেদ থেকে যেকোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য শ্রেণিকক্ষে যে দুটি কাজ করা হয় তা হলো –

১. পূর্বানুমান

২. প্রশ্নোত্তর

পূর্বানুমান

পূর্বানুমান যাচাইয়ে জন্য শিক্ষক প্রথমে পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবি দেখিয়ে পাঠটি কী নিয়ে হতে পারে তা নিয়ে অনুমানভিত্তিক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষক সঠিক গতি, অভিব্যক্তি, স্বরের উঠানামা, শুদ্ধ উচ্চারণের সাথে গল্পটি শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। পড়া শেষে শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান সঠিক ছিল কি না।

প্রশ্নোত্তর

বোধগম্যতার প্রশ্নোত্তরের কাজটি ৩ ধাপে করা হয়-

ধাপ-১: আমি করি: শিক্ষক প্রথম প্রশ্নটির উত্তর কীভাবে খুঁজে বের করতে হয় তা নিজে করে দেখান।

ধাপ-২ আমরা করি: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসাথে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করে।

ধাপ-৩ তুমি কর: শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করার অনুশীলনা করে।

এভাবে শিক্ষক শিক্ষাথীদের অনুমান করতে দিয়ে, প্রশ্ন-উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বোধগম্যতা অনুশীলন করাবেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে –

আক্ষরিক বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি পাঠে দেওয়া আছে। শিক্ষার্থী পাঠে দেওয়া তথ্যগুলো মনে করে উত্তর দিতে পারে। যেমন–

- কে - কোনো প্রশ্ন কে দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ব্যক্তির বা চরিত্রের নাম।
- কী - কোনো প্রশ্ন কী দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বস্তুর নাম।
- কোথায় - কোনো প্রশ্ন কোথায় দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো জায়গার নাম।
- কখন - কোনো প্রশ্ন কখন দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো সময়ের।
- কীভাবে - কীভাবে দিয়ে প্রশ্ন হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বিষয় ঘটার প্রক্রিয়া যেভাবে ঘটেছে তা।

অনুমানসিদ্ধ বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন

অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন - পাঠে সরাসরি উত্তর দেওয়া নেই। কিন্তু সংকেত বা উত্তর কী হতে পারে তা জানা যায়। পাঠের সেই সংকেত বা ঘটনার পরম্পরা বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেয়। যেমন: বাঘ রাখালকে নিয়ে কোথায় গেল?

মূল্যায়নধর্মী বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন –

মূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন– ঘটনার মূল্যায়ন করতে বা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। যেমন: কে বেশি ভালো? লোভী কাঠুরে জলপরির কাছ থেকে কী শিক্ষা পেল?

কাজ

- শিক্ষার্থীদের ছবি দেখে গল্প সম্পর্কে অনুমান করতে বলা
- গল্পের বিষয়বস্তুর সাথে পূর্বানুমানের মিলকরণ
- বোধগম্যতার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা
- উত্তর খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষার্থীদের গল্পটি আবার পড়ে শোনানো
- উত্তর কেমন বের করতে তার কৌশল শেখানো

বোধগম্যতার জন্য শিক্ষক পড়ার পূর্বে কিছু কাজ করেন, আবার পড়ার শেষেও কিছু কাজ করেন। এছাড়াও ১ম ও ৫ম দিনে একই রকম কাজ করলেও ২য় দিনে ভিন্নভাবে কাজ করে থাকেন।

বোধগম্যতার জন্য যেভাবে পাঠদান করা হবে

ধাপ-১
শিক্ষক: এখন আমরা দেখব, পড়ার আগে গল্পটির ছবি দেখে তোমরা যা বলেছিলে, তার সাথে গল্পটি মিলল কি না। (শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান সঠিক ছিল কিনা)
শিক্ষক: এখন আমরা আজকের পড়া গল্পটি থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব। (শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়ক প্রশ্ন করতে পারেন) আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, ... ? শিক্ষক: আমি গল্পটি আবার পড়ব এবং উত্তর খুঁজে বের করব। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে হাত ওঠাব। (শিক্ষক গল্পটি আবার পড়বেন এবং উত্তর পর্যন্ত পড়ে থামবেন ও হাত ওঠাবেন।) শিক্ষক: আমার প্রশ্নটি ছিল, ... ? শিক্ষক: এই যে এখানে আমরা পেলাম ....। (শিক্ষক উত্তরটি বলবেন এবং বোর্ডে উত্তরটি লিখবেন। এবার শিক্ষার্থীদের উত্তরটি বোর্ড থেকে নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন।)

ধাপ-২
শিক্ষক: এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আমরা একসাথে খুঁজে বের করব। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো..............? আমি গল্পটি আবার পড়ব যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমরা হাত ওঠাব। (.......... পর্যন্ত পড়ে শিক্ষক থামবেন এবং হাত ওঠাবেন; দেখবেন কতজন শিক্ষার্থী হাত উঠিয়েছে) শিক্ষক: আমাদের প্রশ্ন কী ছিল? শিক্ষার্থী: ....? শিক্ষক: তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটি কী হবে? শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: ....। শিক্ষক: তাহলে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম, ...। শিক্ষক: (শিক্ষক বোর্ডে '.......' শব্দটি লিখবেন। এবার শিক্ষার্থীদের উত্তরটি বোর্ড থেকে নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন।)

ধাপ-৩
শিক্ষক: এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করতে বলবেন। তৃতীয় প্রশ্নটি হলো.............? আমি গল্পটি আবার পড়ব যেখানে উত্তর আসবে সেখানে তোমরা হাত ওঠাবে। পূর্বের নিয়মে শিক্ষক পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা উত্তর খুঁজে পেলে হাত তুলবে। শিক্ষক ৪-৫ জন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। (এবার শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তরটি নিজ নিজ খাতায় লিখবে।)

এভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বানুমান থেকে প্রশ্নের-উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বোধগম্যতা শেখাবেন।

পঠন দক্ষতার পাঁচটি উপাদান শিশুদের ভাষা শিক্ষা ও পড়ার ভিত্তি তৈরি করে এবং তাদেরকে স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ পাঠক হতে সহায়তা করে। তবে এই পাঁচটির মধ্যে বোধগম্যতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পড়ার আসল উদ্দেশ্যই হলো পাঠ্যাংশের অর্থ উদ্ধার করা। একজন শিক্ষার্থী যদি ডিকোড করতে পারে কিন্তু বুঝতে না পারে, তাহলে পড়ার মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় না।

ডিকোডিং শেখার জন্য যেখানে ধ্বনি সচেতনতা ও বর্ণজ্ঞান বা ফোনিক্স অপরিহার্য, সেখানে বোধগম্যতা বৃদ্ধির জন্য দরকার শব্দভাণ্ডার বিস্তার, সাবলীলভাবে পড়ার সক্ষমতা, সঠিক উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গি এবং টেক্সট থেকে তথ্য বা মূল বার্তা বিশ্লেষণ করতে পারা। যে শিশুরা বুঝে পড়তে পারে, তারা কেবল প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারে না—বরং পাঠ থেকে আনন্দ পায়, আত্মবিশ্বাস অর্জন করে এবং উচ্চতর চিন্তা-ভাবনার দক্ষতা গড়ে তোলে।

সুতরাং, প্রাথমিক শিক্ষায় পঠন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি উপাদানকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হলেও, বোধগম্যতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পাঠচর্চা পরিচালনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অধ্যায় ৫

লিখন শিখন

ভাষার দক্ষতাসমূহের মধ্যে লিখন দক্ষতা অন্যতম। এটি ভাষার একটি স্থায়ী রূপ। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে লিখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লিখন বা লেখার মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। লিখন নৈপুণ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার সম্ভব হয়। লেখার দক্ষতা অর্জন করতে হলে শিশুকে প্রচুর অনুশীলন করতে হবে। লিখন শিখন কয়েকটি পর্যায়ে হয়ে থাকে,প্রাক-লিখন,বর্ণ লেখা, বর্ণযুক্ত করে শব্দ লেখা, শব্দ সাজিয়ে বাক্য লেখা এবং সৃজনশীল লেখা। লিখন একটি ধীর ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, শারীরিক সমন্বয় এবং চিন্তা দক্ষতা প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত।এ অধ্যায়েপ্রাথমিক স্তরে লিখন শিখন,শিশুর প্রাক-লিখনদক্ষতার উন্নয়ন, লেখা শেখার কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে লেখা শিখন

প্রত্যেক শিশুই সহজাতভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে লেখার প্রাথমিক যাত্রা শুরু করে। ধুলোবালি নিয়ে নাড়াচাড়া করা, দু'হাতে বালি টেনে স্তূপ তৈরি করা, আঙুল কিংবা কাঠি দিয়ে ধুলোবালির ওপর আঁচড় কাটা ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়েই তার লেখার জন্য পেশিগুলো কর্মক্ষম হতে থাকে। হাতের কাছে কাগজ কলম পেলে শিশু ইচ্ছেমত আঁচড় কাটা, হিজিবিজি আঁকা শিখতে শিখতে বর্ণ লেখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে।

লেখার পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কাজ

লেখার পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক কাজ হিজিবিজি আঁকা যেমন-

- উপর-নিচে দাগ দেওয়া
- পাশাপাশি দাগ দেওয়া
- ডট (.) চিহ্ন দেওয়া
- অর্ধ-গোলাকার দাগ দেওয়া
- গোলাকার দাগ দেওয়া
- রেখা দ্বারা আবদ্ধ করা ইত্যাদি।

শিশুর প্রাক-লিখন দক্ষতার উন্নয়ন

- সাধারণত আঁচড় কাটা বা হিজিবিজি আঁকার মধ্য দিয়েই একটি শিশুর লেখা আরম্ভ হয়। তারপর থেকে সে দাগ টানতে শুরু করে। আঠারো মাস বয়স থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে দাগ টানার সামর্থ্য অর্জন করে।

- দুই বছর বয়স থেকে শিশু আনুভূমিকভাবে (পাশাপাশি) রেখা টানে এবং উল্লম্বভাবে (উপর থেকে নিচে) দাগ টানতে শুরু করে। আড়াই বছর পর্যন্ত সে এভাবেই চলতে থাকে। তিন বছর থেকে শিশু গোলাকার দাগ দিতে শেখে।

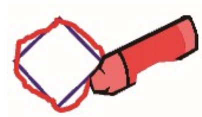

- সাড়ে তিন বছর বয়সে শিশুরা দেখে দেখে বর্ণ আঁকতে চেষ্টা করে। তারা তখন থেকে ডট (.) দিয়ে আঁকা কোনো চিত্র দেখে আঁকার চেষ্টা করে। যদিও এক্ষেত্রে তাদের আঁকা চিত্রের কোণগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃত্ত চাপের ন্যায় ঘোরানো রূপ লাভ করে।

- যোগচিহ্ন দেওয়ার সামর্থ্য অর্জিত হয় শিশুর ৪ বছর বয়সে। সুচারুভাবে না হলেও তখন থেকে শিশুরা ডট (.) অনুসরণ করে বর্গ এবং ত্রিভুজ আঁকতে পারে। ৫ বছর বয়সের আগেই সে সাধারণভাবে বর্গক্ষেত্র আঁকতে পারে এবং ডট (.) চিহ্ন দেওয়া ডায়মন্ড আকৃতি দাগ টেনে সম্পূর্ণ করতে পারে।

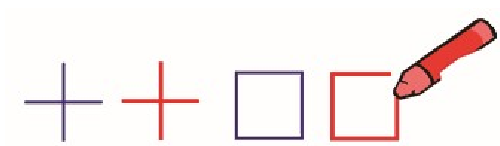

- পরবর্তী ১ বছরের মধ্যেই শিশুরা এক্ষেত্রে অনেক দক্ষতা অর্জন করে এবং সমর্থ হয়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়েই শিশুরা ধীরে ধীরে বর্ণ আঁকতে ও লেখার দক্ষতা অর্জনের পথে পা দেয়।

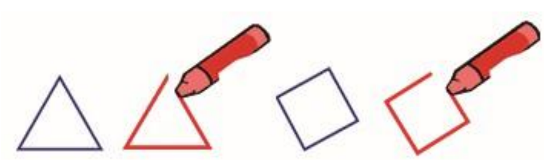

প্রকাশমূলক দক্ষতার অন্যতম দক্ষতা হলো লেখা। আমরা যা মুখে বলি 'লেখা' অর্থ শুধুমাত্র সেটাই প্রকাশ করা নয়। অধিকন্তু এর মাধ্যমে আমরা ধারণা ব্যক্ত করি, চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করি এবং অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। লেখা-দক্ষতার মাধ্যমে সার্থক যোগাযোগ করতে প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন।

লেখা শেখার কলাকৌশল

ক) পেন্সিল নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা : যে সকল শিশু আদৌ লিখতে শেখেনি তাদের বর্ণ লেখা শেখানোর পূর্বেই পেন্সিল বা কলম কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা শেখানো অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে কলমের পরিবর্তে পেন্সিল দিয়ে লেখা শুরু করাই শ্রেয়। তবে পেন্সিল ব্যবহার করার পূর্বেই শ্রেণিতে বা শ্রেণির বাইরে কাঠি দিয়ে, আঙুল দিয়ে খাতায় বা মাটিতে বর্ণের গঠন বা প্যাটার্ন আঁকতে সহায়তা করা উচিত। কারণ কলম অপেক্ষা পেন্সিল নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। যখন তারা বর্ণের গঠন লিখতে সমর্থ হবে তখনই তাদেরকে কলম দেওয়া উচিত।

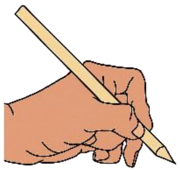

লেখার আগেই শিক্ষকের উচিত কীভাবে পেন্সিল ধরতে হয় তা দেখানো। এতে করে শিশুর দক্ষতা অর্জিত হলেও কেবল

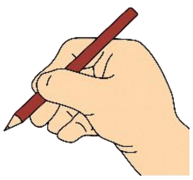

ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে (খাতা ধরা, পেন্সিল ধরা ইত্যাদি) লেখায় দুর্বলতা থেকে যেতে পারে।

খ) সঠিকভাবে পেন্সিল ধরা : উত্তম লেখা অনেকাংশ সঠিকভাবে পেন্সিল ধরার উপর নির্ভরশীল। তাই লেখা ভালো করার জন্য কীভাবে পেন্সিল ধরতে হয় তা শিশুদের জানানো প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষকের প্রয়োজন –

- কীভাবে মধ্যমার অগ্রভাগের উপর পেন্সিলের অবস্থান দিতে হয় তা দেখানো;
- অগ্রভাগ থেকে প্রায় ১ ইঞ্চি উপরে পেন্সিল ধরতে বলা;
- বেঞ্চের/ টেবিলের উপর কাগজ বা খাতা একটু কোনাকুনিভাবে স্থাপন করতে বলা।

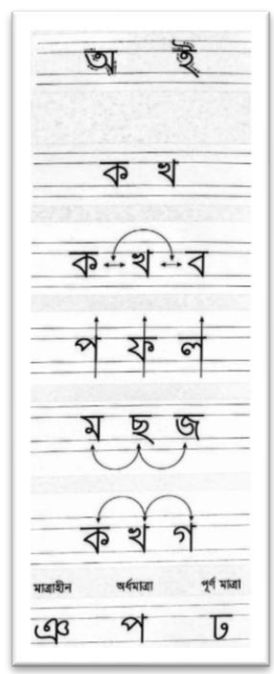

গ) প্যাটার্ন বা আকৃতি আঁকা : বর্ণ লেখার পূর্বেই খাতায় প্যাটার্ন বা আকৃতি আঁকতে শেখানো অত্যাবশ্যক। কারণ সাবলীলভাবে পেন্সিলের গতি নিয়ন্ত্রণ এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রচ্ছন্নভাবে শিশুর আঁকা প্যাটার্নের মধ্যেই বর্ণ লেখার অনেক কিছু বিদ্যমান।

সপ্ত স

সঠিকভাবে বর্ণ লেখার ক্ষেত্রে ‘সপ্ত স’ বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে–
সপ্ত স হচ্ছে–

১. সঠিক প্রবাহ
২. সঠিক আকৃতি
৩. সমান্তর বা সমদূরত্ব
৪. সমান্তরাল
৫. সমশির

৬. সমপদ
৭. সঠিক মাত্রা।

সঠিক প্রবাহ: বর্ণ লেখার সময় কোন স্থান থেকে শুরু করে কোন স্থানে শেষ করতে হবে তার গতি প্রবাহ নির্দেশনা দেওয়া। শিক্ষক নম্বর অনুযায়ী তীর চিহ্ন মেনে বর্ণগুলো লিখতে বলবেন।

সঠিক আকৃতি: প্রতিটি বর্ণের আকৃতি যেন সমান হয় তা শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করতে বলা এবং শিক্ষককে অনুসরণ করা।

সমান্তর বা সমদূরত্ব: বর্ণগুলোর মধ্যকার দূরত্ব সমান হওয়া আবশ্যক। এটি বাক্য লেখার ক্ষেত্রেও প্রতিটি শব্দের মধ্যকার দূরত্ব সমান হবে।

সমান্তরাল: বর্ণগুলোর আনুভূমিক ও উল্লম্বিক বিস্তৃতি সমান্তরাল হবে।

সমপদ: প্রতিটি বর্ণের নিচের অংশ সমান হবে।

সমশির: প্রতিটি বর্ণের উপরের অংশ সমান হবে।

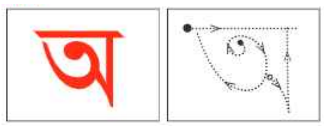

সঠিক মাত্রা: কোন কোন বর্ণ পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন তা লেখার সময় খেয়াল করা।

লিখন শিখনে শিক্ষকের করণীয়

- লেখার বিষয়ে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল করে না তোলা;
- পঠনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া।

অধ্যায় ৬

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা

সাহিত্য আসলে মানব মনের আত্মমগ্নতার স্বরূপ। এই আত্মমগ্নতার ভাবনায় আছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক,প্রবন্ধ ইত্যাদি। শ্রীশচন্দ্র দাশের ভাষায়– 'মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। সে নিজেকে বাহিরে দেখিতে চায়। মানুষের মধ্যে , অপরের মধ্যে সে আপনাকে পাইতে চায়।' নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। কল্পনার জগতে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আবিষ্কার করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় সাহিত্যের অর্থ হচ্ছে নৈকট্য বা সম্মিলন। তিনি সাহিত্যকে তুলনা করেছেন বনস্পতি বৃক্ষের সাথে। যার আয়ু দীর্ঘ, দেহ বিচিত্ররূপে আকৃতিবান, শাখায়িত তার বিস্তার। হরপ্রসাদ মিত্রের ভাষায়–'সাহিত্য আমাদের জীবন-সত্যেরই সহজ পাঠ।' সাহিত্য হচ্ছে জীবনের দর্পণ স্বরূপ। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সময় ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিবিম্ব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। সাহিত্য পাঠকমনকে পরিচয় করিয়ে দেয় সময়ের সাথে, সংস্কৃতির সাথে, মানুষের সাথে। মানুষের মনের অনুভূতি, দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় সাহিত্যে। সাহিত্যের রূপ-রূপান্তর ঘটে সময়ের সূত্রে এবং বাস্তবতার অনুষঙ্গ থেকে। মানুষের জীবনের অসীম বৈচিত্র্য নিয়ে নানাদিকে সাহিত্যের বিচরণ। সাহিত্য সৃষ্টি করে একটি ব্যক্তিমানস কিন্তু একক মনের গণ্ডী পেরিয়ে সাহিত্য হয়ে ওঠে বিশ্ব মানবের মনের কথা।সাহিত্য তুলে ধরে কালের চিত্র, কালোত্তীর্ণ হয়ে। এ অধ্যায়ে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে শিশুতোষ সাহিত্য, ছবির পাঠ, ছড়া ও কবিতা, গল্প-প্রবন্ধ-কথোপকথনধর্মী রচনা বিষয়ে আলোচনা করে এসব বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, ছড়া, প্রবন্ধ, মহাকাব্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, রম্য রচনা, অনুবাদ সাহিত্য শিশুতোষ সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে এসব শাখায় অবদান রেখেছেন বিভিন্ন কবি ও লেখক।

সাহিত্য প্রধানত দুই ধরনের–মন্ময় সাহিত্য (Subjective literature) এবং তন্ময় সাহিত্য (Objective literature)। যখন সাহিত্যিক একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করেন, তখন তাকে মন্ময় সাহিত্য বলা হয়। যেমন: কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। আর সাহিত্যে বস্তুসত্তা যখন প্রাধান্য পায় তখন তাকে তন্ময় সাহিত্য বলে। যেমন: প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গবেষণাধর্মী লেখা ইত্যাদি। এছাড়া সাহিত্যকে আরও দুই ভাগে ভাগ করা যায়; জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্য। জ্ঞানের সাহিত্যে লেখকের বিষয়বস্তুতে ব্যক্তি অনুভূতির চেয়ে বস্তুনিষ্ঠতা ফুটে ওঠে। যেমন:রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্ব পরিচয়', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা ইতিহাস' রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি। আর ভাবের সাহিত্যে লেখকের বিষয়বস্তুতে স্বীয় আবেগ অনুভূতির প্রকাশ পায়। যেমন: কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি।

শিশুতোষ সাহিত্য

'শিশুতোষ' কথাটির দুটি অংশ 'শিশু' এবং 'তোষ'। শিশু কথাটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। আর 'তোষ' অর্থ 'আনন্দ' বা 'খুশি'। 'শিশুতোষ সাহিত্য' হলো, অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় লিখিত ছড়া, কবিতা ও গল্প, যা শিশুর বয়স-উপযোগী, চাহিদা অনুযায়ী লেখা হয় এবং যা পড়তে শিশুরা আনন্দ পায়, যা পড়ে শিশুরা খুশি হয় এবং মজা পায়।

সহজ করে বললে, শিশুদের উপযোগী সাহিত্যই শিশুতোষ সাহিত্য। গল্প হচ্ছে শিশুতোষ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ধারা। শিশুরা যে ধরনের গল্প, কাহিনি পছন্দ করে, তারই সুবিন্যস্ত সাহিত্যরূপ শিশুতোষ গল্প। ধরাযাক, ছবির বইয়ের কথা। শুধু ছবি, কোনো কথা নেই। ছবির মধ্যেই অনেক ঘটনা বা কাহিনি লুকিয়ে আছে। একটা ছবি আসলে অনেক কথা বলে। শিশুর কল্পনাশক্তি এই কথা বা ভাষা বুঝতে সহায়তা করে।

শিশুতোষ সাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ

শিশুতোষ সাহিত্যে অনেক শাখা আছে। ছবির বই, ছড়া, গল্প, ছবিতে গল্প, ছবি প্রধান গল্প ইত্যাদি। আবার গল্পেরও নানা আঙ্গিক রয়েছে। যেমন- রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চার, গল্প জীবনী, হাসির গল্প, ব্যাঙ্গাত্মক গল্প, সামাজিক পরিবেশের গল্প, কমিক, নৈতিক গল্প, প্রকৃতি নিয়ে গল্প ইত্যাদি।

শিশুতোষ সাহিত্যের বিকাশ

উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতাকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কারণ এ সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণির সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার বেশি প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে তখন শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন দেখা দেয়। রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রায়কমল সেন প্রমুখের উদ্যোগে কোলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি উপদেশমূলক আঠারোটি গল্পের সমন্বয়ে প্রথম শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে। এ পুস্তকগুলোতে সন্নিবেশিত রচনা শিশুতোষ পর্যায়ের বলা না গেলেও এটি ছিল শিশু সাহিত্য সৃষ্টির প্রাথমিক প্রয়াস। পরবর্তীকালে এ সম্ভার আরও সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখের শ্রম, মেধা ও নিষ্ঠায়। এ সময়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকার ‘খুকুমণির ছড়া’ নামে মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছড়ার একটি সংকলন করে শিশুসাহিত্যের নতুন ধারার সূচনা করেন। তাঁর সাহিত্যে স্থান পায় গল্প, ছড়া, কবিতা ও জীবজন্তু বিষয়ক কাহিনি। তিনি পশুপাখির মুখ দিয়ে মানুষের মতো কথা বলিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে ক্ষুদে পাঠকদের মন জয় করেন। এ ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখের হাতে বাংলা শিশুসাহিত্য বিষয়বৈচিত্র্যে ও প্রকরণে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। শিশুতোষ সাহিত্যের সংগ্রহ, সৃষ্টিশীল রচনা, আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা শিশুতোষ সাহিত্যে নবতর মাত্রা সংযোজন করেন। কাজী নজরুল ইসলামও অনেক কালজয়ী শিশুতোষ সাহিত্যের স্রষ্টা। সুকুমার রায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম, অন্নদাশঙ্কর রায়, আহসান হাবীব, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, এখলাসউদ্দিন আহমদ, সুকুমার বড়ুয়া এবং এ রকম আরও অনেকের সঙ্গে সাম্প্রতিক লুৎফর রহমান রিটনের মতো কবি ও ছড়াকারদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের শিশুপ্রিয় সাহিত্যজগৎ।

শিশুর ভাষাদক্ষতা বিকাশে শিশুতোষ সাহিত্য : ছবির পাঠের গুরুত্ব

কোনো ভাষা শেখার অর্থ হলো শুনতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে শেখা। অর্থাৎ এই ভাষা-দক্ষতাগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করে প্রয়োজনের সময় যথাযথভাবে তা ব্যবহার করতে পারা। ছবির বই শিশুর শোনা ও বলা ভাষা-দক্ষতা দুটি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। কেননা, ছবি দেখে শিশু সাধারণত তার কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভাষায় ঘটনার বর্ণনা দিতে পারে। ছবিতে প্রকাশিত ভাষার সাথে শিশু তার কল্পনাকে একাকার করে দেখে। প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে ছবির মাধ্যমে গল্প শোনার ফলে শিশুর শোনা ও বলা ভাষা-দক্ষতা দুটি সমানভাবে বিকাশ লাভ করে। তাই প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণিতে ছবির বই, ছড়ার বই বা ছবিতে গল্প বলার অনুশীলন ভাষা-দক্ষতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ছবির পাঠে গল্পের কোনো নাম নেই।গল্পটি শুনে শিশু নিজেই এর একটি নাম দেবে। শোনার পাশাপাশি কল্পনার জগতে প্রবেশ করে নিজেই রংতুলি নিয়ে কল্পনার জগৎ ঘুরে সৃজনশীল ভুবনে প্রবেশ করবে। ছবি পড়া অর্থ শুধু ছবি, দেখা নয় ছবিগুলো এমন, যেন সেখানে অনেক কথা লুকিয়ে আছে। এই লুকানো কথা একেকজন শিশু একেক রকম চিন্তা বা কল্পনা করে। তাই এ ধরনের ছবির বই শিশুর কল্পনার জগৎকে অনেক বেশি প্রসারিত করে, রাঙিয়ে তোলে।

প্রাথমিক স্তরে ছবির পাঠ বা পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট ছবির ব্যবহার একটি পরিচিত বিষয়। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বইগুলো ভালোভাবে লক্ষ করলেই দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি পাঠের সঙ্গেই ছবি রয়েছে। এর কোনোটি শুধুমাত্র ছবির পাঠ আবার কোনোটি পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবির ব্যবহার। প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে ছবির

পাঠ বেশি, লেখার পরিমাণ কম। আর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে লেখার পরিমাণ বেশি, ছবির পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে গেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে ছবি কিংবা পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি দেখেও পাঠ বুঝতে পারে এবং পাঠটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা পায়।

পাঠে ছবি ব্যবহারের উদ্দেশ্য

- পাঠ/পাঠের অংশের বিষয়বস্তুকে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য;
- ছবি দেখে বলার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য;
- শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি বা মূল্যায়নের জন্য;
- বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বর্ণনায় শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্য;
- শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য।

ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন

ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশলের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়:

- ছবির বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ (যেমন, ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?);
- ছবির চরিত্র, স্থান, কাল, পাত্র বিশ্লেষণ (যেমন, ছবিতে কী কী চরিত্র আছে? ছবিতে কে কী করছে? ছবির মানুষগুলো কী করছে? ছবির পশু-পাখি বা জীব-জন্তুগুলো কী করছে? ছবিতে ফুল, ফল, শাক, সবজি, প্রভৃতি আর কী কী আছে? সেগুলো কোথায় কী অবস্থানে আছে? এদের, রং, আকার-আকৃতি কেমন?);
- ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছবি বিশ্লেষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- ছবির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জীবনের মিল/যোগসূত্র কোথায়;
- ছবির স্থান, কাল, চরিত্র পাল্টিয়ে গল্প বলা;
- শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া, অনুরূপ ঘটনা জানতে চাওয়া;
- ছবির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা সারমর্ম তুলে ধরা;
- সংক্ষেপে ছবির একটি শিরোনাম দেওয়া;
- ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ছবি আঁকার কাজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিশুকে অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন করা, যেমন- এর পর কী হতে পারে, ছবির চরিত্র কী করতে পারে, প্রভৃতি।

নিচের পাঠ্যবইয়ের ছবিদুটি পর্যবেক্ষণ করে বিষয়বস্তু বোঝার চেষ্টা করি।

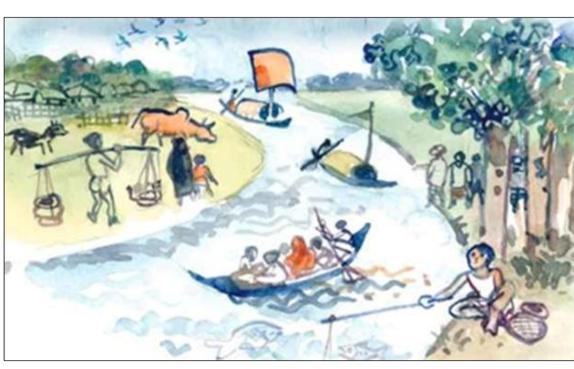

ছড়া ও কবিতা

সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারার একটি হলো পদ্য সাহিত্য। প্রাচীন যুগে বাংলা সহিত্য ছিল হালকা ও দ্রুত চালের ছন্দোবদ্ধ পদের সমন্বয়ে রচিত ছান্দসিক পদ যা অধুনাকালের ছড়ার-ই আদিরূপ। তাইতো ছড়াকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ছড়া মূলত এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ সমিল বা অমিল পদ্যবিশেষ। বাংলা ভাষার প্রাঞ্জল সাহিত্যরূপ খুঁজে পাওয়া যায় ছড়াগুলোয়। অর্থের গভীরতা নয়, শিশুসুলভ সরলতা, কল্পময়তা, চিত্রময়তা এবং শব্দের ধ্বনিময়তাই ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শব্দের ধ্বনিময়তা আর পদে পদে ছড়ানো কথার একেকটি ছবির সমন্ব

যেকোনো ছন্দোময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির নাম-ই ছড়া। অনাবিল আনন্দদানই হচ্ছে ছড়ার উদ্দেশ্য।

ছড়ার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ছড়া মূলত আবেগ অনুভূতিজাত, যেখানে উদ্ভট ও অযৌক্তিক বিষয়ও নানা রঙে ও ঢঙে রঞ্জিত হয়ে শিশু মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যেমন—

গাঙের পানি ছলছলায়

খোকন সোনা কলকলায়

গাঙের ইলিশ মাছ—

বলে ডেকে, খোকন মণি

আয় দেখে যা নাচ।   (আয় দেখে যা নাচ- সুফিয়া কামাল)

ছড়ার নিজস্ব ছন্দ আছে। ছড়া স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। উচ্চারণের দ্রুততা ও সবলতা স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্রুততা, প্রবল শ্বাসাঘাতের জন্যই স্বরবৃত্ত ছন্দ অধিকতর প্রাণবন্ত এবং কথ্যভাষার উপযোগী হয়ে উঠেছে। স্বরবৃত্ত ছন্দ ৪/৪ ছন্দে রচিত।

সাত লাঠিতে|ফড়িং মারেন |এমনি পালো |য়ান

দাঁত দিয়ে সে |ছিঁড়লে সেদিন |মস্ত আলো |য়ান

মাত্রাবিন্যাস : ৪+৪+৪+২ = ১৪

রাত পোহাল |ফরসা হল |ফুটল কত |ফুল

উড়িয়ে পাখা |নীল পতাকা |জুটল অলি |কুল

মাত্রাবিন্যাস : ৪+৪+৪+১ = ১৩

স্বরবৃত্ত ছন্দে বদ্ধাক্ষর ও মুক্তাক্ষর দুই ক্ষেত্রেই এক মাত্রা হয়ে থাকে। উপর্যুক্ত ছড়াগুলো ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং ২ ও ৩ মাত্রার অপূর্ণ পর্বে গঠিত (আবৃত্তির সময় এক নিশ্বাসে যতটুকু চরণ একবারে উচ্চারিত হয় তাকে পর্ব বলে)।

ছড়ার গুরুত্ব

ছড়া আমাদের চারপাশের নানা দৃশ্যকে ছবির মতো এঁকে দেয় শিশুমনে। নদীর জল যে টলমল করে বা নদীতে নৌকা চলে এইসব তথ্যগুলো আলাদা করে শেখাতে হয় না। ছড়ার মধ্যে শুনতে শুনতে শিশুমনে একটি ভাবকল্পের সৃষ্টি হয়। ছড়া সহজেই দৃঢ়তর করতে পারে শিশুর কল্পনাশক্তিকে। যেমন– লেজ ঝোলা পাখি, বা বাদুড়ের বিয়েতে চামচিকার বাজনা বাজানো, অতিথিদের আপ্যায়ন ইত্যাদি।

সার্বিকভাবে ছড়ার গুরুত্বের বিষয়ে যে বিষয়গুলো শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে ওঠে তা হচ্ছে–

- ছড়া শিশুকে আনন্দ দেয়
- বলতে উৎসাহী করে
- প্রমিত উচ্চারণ-রীতি অনুসরণে সহায়তা করে
- শিশুর মধ্যে ছন্দবোধ সৃষ্টি করে
- কল্পনা বিস্তারে সহায়তা করে
- শিশুর বাক্য যোজনায় উৎসাহী করে তোলে
- সৃজনশীল হতে সাহায্য করে
- নতুন নতুন শব্দ শিখনে সহায়তা করে
- দৃশ্যমান জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে
- শিশুকে শোনা, বলা, পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলে
- ভাষা গঠন ও অর্জন উভয় পর্যায়েই ছড়া শিশুর ভাষা- দক্ষতা বিকাশের অন্যতম সহায়ক উপায়।

কবিতা

ভাষা যখন নিবিড় উপলব্ধিতে আবেগ ও প্রাণময় হয়, তার ভেতরে গতির সঞ্চার হতে থাকে। এই বেগ বা গতির সংযত ও পরিমিত প্রকাশই কবিতা। কবিতা 'শব্দ' ভাব কল্পনা ও অর্থ-ব্যঞ্জনার বাহন। কবিতা হৃদয়ের কাছে আবেগদীপ্ত উপলব্ধির ভাষা। সাধারণভাবে ছন্দোবদ্ধ পদকে কবিতা বললেও কেবল ছন্দই কবিতার শেষ কথা নয়। বস্তুত জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত নিজস্ব উপলব্ধিগুলো আত্মগত ভাবরসে সিক্ত করে কবি যখন ব্যঞ্জনাময় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন তখন তাকে কবিতা বলে। ইংরেজ কবি Wordsworth-এর ভাষায় "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquility." অর্থাৎ কবিতা হচ্ছে শক্তিময় অনুভূতির স্বতঃস্ফুর্ত উচ্ছ্বাস।

শ্রীশচন্দ্র দাশের ভাষায় –'কবির বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ই কবিতার জন্মভুমি। কোন একটি বিশেষ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া কবির আনন্দ-বেদনা যখন প্রকাশের পথ পায়, তখনই কবিতার জন্ম।'

কবির আত্মগত ভাব-বিহবলতা কবিতা নয়, বরং বহির্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ, বস্তুজগৎ ও মনোজগতের সম্মিলনে যখন কবিমন আন্দোলিত হয়, তখন সে আবেগকে কবি তাঁর অনুভূতি-স্নিগ্ধ কল্পনায় অনন্য অবয়ব দান করে কবিতা সৃষ্টি করেন। তাই কোলরিজ কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-'Best words in best order'-ই কবিতা।

বিচিত্র ধারার কবিগণ বৈচিত্র্যপূর্ণ কবিতা লিখে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারায় স্মরণীয় হয়ে আছেন যেমন : হোমারের ওডিসি, জন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, দান্তের ডিভাইন কমেডি, গ্যেটের ফাউস্ট, কোলরিজের কুবলা খান, জন কিটসের

ওড অন এ গ্রেসিয়ান আর্ন, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, নজরুলের বিদ্রোহী, জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা । এদের কাউকে একসূত্রে গাঁথা যায় না। তবু তাদের এসব সৃষ্টি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। সুতরাং বলা যায় কবিতা বহু রকমের, কবিতাকে সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। কবিতা উপলব্ধির বিষয় , আত্মার শান্তি দেয়ার জন্য কবিতার সৃষ্টি।

কবিতার ধরন

কবিতা অনেক রকমের হয়। রস ও রূপতত্ত্বের বিচারে কবিতা দুই ধরনের হয়—

ক) বস্তুনিষ্ঠ কবিতা: গাথাকাহিনি, মহাকাব্য, রূপক-ব্যঙ্গ-গীতিকাব্য, গীতিনাট্য ইত্যাদি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কায়কোবাদ এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত মহাকাব্যসমূহ, মঙ্গলকাব্য এবং বিভিন্ন প্রণয়োপাখ্যান ইত্যাদি এই জাতীয় কাব্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

খ) গীতি কবিতা: ভক্তিমূলক, স্বদেশপ্রেমমূলক, প্রেম ও প্রকৃতিমূলক কবিতা। সনেট, শোকগীতি, বাংলা বৈষ্ণব কবিতা এ গোত্রের কবিতা। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী, বিহারীলাল চক্রবর্তীর সাধের আসন, সারদামঙ্গল, মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেট, চতুর্দশপদী কবিতা ইত্যাদি এ পর্যায়ের কবিতা।

অন্যভাবে বললে, কবি যখন বস্তুজগৎকে যথাযথভাবে কবিতায় প্রকাশ করেন তখন তা তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা। আর কবির নিজের অন্তর অনুভূতি,ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা,ভাবনাচিন্তা কবিতায় প্রতিফিলিত হলে তা মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা।

বাংলা ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি

ছড়া ও কবিতা আবৃত্তির স্বতন্ত্র নিয়ম রয়েছে; তা গদ্যের মতো পড়লে চলে না। সাধারণত পাঠ ও আবৃত্তিকে সমার্থক ভাবা হলেও পাঠ ও আবৃত্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। আবৃত্তির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে প্রত্যেকটি ধ্বনি শ্রোতার কানে পৌছে দেওয়া। নির্বাচিত শব্দের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ কাব্যে যে মাধুর্যের সৃষ্টি করে তার রসাস্বাদন করতে রচনার তাল, লয়, গতি, ছন্দ মেনে আবৃত্তি করতে হবে। ছড়া বা কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য রীতিনীতিগুলো— ছন্দ, মাত্রা, অক্ষর, তাল, লয়, উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরের উঠানামা, আঞ্চলিকতা, সাবলীলতা, উপস্থাপন ইত্যাদি।

ছন্দ

বাংলা গদ্যের ছন্দ হলো গদ্যের মধ্যে শাব্দিক সুর বা প্রবাহ, যা শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ, শব্দের আওয়াজ এবং বাক্যের নির্মাণে এক ধরনের সুষমতা ও সঙ্গতি সৃষ্টি করে। এটি কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা পরিষ্কার মাত্রাবদ্ধ রীতি নয়, তবে গদ্যে প্রাকৃতিকভাবে যে সুরময়তা বা মনোরম প্রবাহ থাকে, তা গদ্যের ছন্দ হিসেবে পরিচিত। প্রখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে— 'ছন্দ হলো যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে।' ছন্দের কিছু উপাদান রয়েছে। যেমন- অক্ষর, মাত্রা, যতি, ছেদ,পর্ব, চরণ, স্তবক ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে অক্ষর বা মাত্রা হচ্ছে ছন্দের মূল উপাদান।

বাংলা কবিতার ছন্দ প্রধানত তিন প্রকার। ১. স্বরবৃত্ত; ২. মাত্রাবৃত্ত; ৩. অক্ষরবৃত্ত। ছন্দ সম্পর্কে জানার আগে অক্ষর, যতি, মাত্রা, পর্ব ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা আবশ্যক।

অক্ষর: সাধারণত অক্ষর বলতে বর্ণকে বোঝালেও, বাংলা ব্যাকরণে অক্ষর হলো বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা এক ঝোঁকে যে অংশটুকু উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বা দল বলে। যা ইংরেজিতে Syllable বলে । যেমন- কলম, শর্বরী, কুঞ্জ। এখানে 'কলম' তিনটি বর্ণে লিখলেও উচ্চারণে করতে গিয়ে 'ক' ও 'লম্' এই দুই ভাগে আমরা উচ্চারণ করছি। অর্থাৎ 'কলম' শব্দটিতে দু'টি অক্ষর। উল্লেখ্য যে, 'ক' ধ্বনি উচ্চারণে বাগযন্ত্রের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না তাই এ ধরনের অক্ষরকে বলে

'মুক্তাক্ষর'। অপরদিকে 'লম' ধ্বনিটি উচ্চারণে বাগযন্ত্র কোথাও না কোথায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে এ প্রকার অক্ষরকে বলে 'বদ্ধাক্ষর'।

মাত্রা: একটি অক্ষর উচ্চারণে যে সময় প্রয়োজন হয়, তাকে মাত্রা বলে। আপাতদৃষ্টিতে অক্ষর ও মাত্রা একই মনে হলেও এদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। মূলত, এই মাত্রার ভিন্নতাই বাংলা ছন্দগুলোর ভিত্তি। বাংলা ছন্দে মুক্তাক্ষর সব সময় এক মাত্রায় গণনা করা হলেও, বদ্ধাক্ষর কখনো এক মাত্রা আবার কখনো দুই মাত্রায় গণনা করা হয়।

যতি: কোনো বাক্য পড়ার সময় শ্বাসগ্রহণের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যে উচ্চারণ বিরতি নেওয়া হয়, তাকে ছন্দ-যতি বা শ্বাস-যতি বলে। যতি মূলত দুই প্রকার- হ্রস্ব যতি ও দীর্ঘ যতি। অল্পক্ষণ বিরতির জন্য সাধারণত বাক্য বা পদের মাঝখানে হ্রস্ব যতি দেওয়া হয়। আর বেশিক্ষণ বিরতির জন্য সাধারণত বাক্য বা পদের শেষে দীর্ঘ যতি ব্যবহৃত হয়।

পর্ব: বাক্য বা পদের এক হ্রস্ব যতি হতে আরেক হ্রস্ব যতি পর্যন্ত অংশকে পর্ব বলা হয়। যেমন—

একলা ছিলেম। কুয়োর ধারে। নিমের ছায়া। তলে ।।

কলস নিয়ে। সবাই তখন। পাড়ায় গেছে। চলে।। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(।- হ্রস্ব যতি ও ।।- দীর্ঘ যতি)

এখানে একলা ছিলেম, কুয়োর ধারে, নিমের ছায়া, তলে- প্রতিটিই একেকটি পর্ব। তবে প্রথম তিনটি পর্ব এক রকম হলেও শেষের পর্বটি একটু ভিন্ন; যেন আগের গুলো অর্ধেক। তাই শেষ পর্বটিকে অপূর্ণ পর্ব ও বাকি তিনটি পূর্ণ পর্ব। এখানে প্রতিটি পূর্ণ পর্বই ৪ মাত্রার ও অপূর্ণ পর্ব ২ মাত্রার।

শ্বাসাঘাত: প্রায়ই বাংলা কবিতা পাঠ করার সময় পর্বের প্রথম অক্ষরের উপর একটা আলাদা জোর দিয়ে পড়তে হয়। এই অতিরিক্ত জোর দিয়ে পাঠ করা বা আবৃত্তি করাকেই বলা হয় শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর। যেমন—

আমরা আছি। হাজার বছর। ঘুমের ঘোরের। গাঁয়ে ।।

আমরা ভেসে। বেড়াই স্রোতের। শেওলা ঘেরা। নায়ে।। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এখানে প্রতিটি পর্বের প্রথম অক্ষরই একটু ঝোঁক দিয়ে, জোর দিয়ে পড়তে হয়। এই অতিরিক্ত ঝোঁক বা জোরকেই শ্বাসাঘাত বলে।

ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল

ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে ছন্দ তাল ঠিক রেখে শিশুদের ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিশুরা মনোযোগসহকারে শুনবে। এর পর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অঙ্গভঙ্গিসহকারে আনন্দের সাথে ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে শিক্ষক কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। শিক্ষক কবিতা পড়ে শোনাবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কবিতা পঠন সুনির্দিষ্টভাবে পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ধাপ ১: শিক্ষক যতি ও ছন্দ বজায় রেখে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি একবার (প্রয়োজনে একাধিকবার) প্রত্যেকটি শব্দ নির্দেশ করে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে শুনবে।

ধাপ ২: শিক্ষক প্রত্যেকটি শব্দ আঙুল নির্দেশ করে পড়বেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও সরবে পড়বে। এই ধাপে শিক্ষক প্রয়োজনে ২/৩ বার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে পড়বেন। এ সময় তিনি লক্ষ রাখবেন, সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কিনা। কোনো শব্দ বা বাক্য শিক্ষার্থীরা পড়তে না পারলে শিক্ষক ঐ শব্দ বা বাক্যটি আবার পড়বেন।

ধাপ ৩: শিক্ষক নির্দিষ্ট একজন শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে পড়বেন। শিক্ষক এই ধাপে বেশি করে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়বেন। এভাবে এক এক করে ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে পড়বেন।

ধাপ ৪: উৎসাহী শিক্ষার্থীকে দিয়ে একা পড়াবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পুরো কবিতাটি পড়াবেন। এভাবে কয়েকজনকে দিয়ে এককভাবে পড়াবেন।

ধাপ ৫: একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। তার সঙ্গে সব শিক্ষার্থী সরবে পড়বে।

এছাড়া আমি করি, তুমি কর এবং আমরা করি পদ্ধতিতেও ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো অনুশীলন করানো যায়।

ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন

ছড়া	কবিতা
▪ ছড়া-সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা/ঘটনা আছে কি না তা জানতে চাওয়া ▪ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা ▪ ছবি বিশ্লেষণ ▪ ছড়াটি কয়েকবার আবৃত্তি করা ▪ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আবৃত্তি করানো: সমবেত ভাবে, দলে, জোড়ায় ও এককভাবে ছড়াটি আবৃত্তির অনুশীলন করান ▪ ছন্দ মিলিয়ে শব্দ বলতে দেওয়া ▪ ছড়া-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা ▪ শিক্ষার্থীদের জানা ছড়া বলতে উৎসাহ প্রদান করা ▪ ইচ্ছেমতো ছবি আঁকার অনুশীলন।	▪ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন করা ▪ ছবি বিশ্লেষণ ▪ কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলা ▪ আবৃত্তি করা, আবৃত্তিকালে শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন, অর্থ বলে দেওয়া ▪ আবৃত্তির অনুশীলন করানো ▪ পাঠের শব্দ ধরে কবিতা পড়তে সহায়তা করা ▪ কবিতা-সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজের অনুশীলন করানো

গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা

বিষয়বস্তুর দিক হতে জীবনের একটা খন্ডাংশ মাত্র ছোটোগল্পে উপস্থাপন করা হয়। ছোটোগল্পে ব্যক্তিজীবনকে একটা বিন্দুতে আবদ্ধ করে আবর্তিত হয় অন্যদিকে প্রবন্ধ লেখকের বুদ্ধিবৃত্তিক রচনা।প্রবন্ধের বিষয়বস্তু খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় প্রবন্ধের উপজীব্য । আর কথোপকথনধর্মী রচনা বা নাটক জীবন সম্পর্কিত ধারণার এমন এক কাব্যিক প্রকাশ যেখানে অভিনেতারা একটা রূপ দিতে পারে, তারা মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে। নাটকে রস উপলব্ধির বিষয়টি জড়িত বলে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয়। এসব ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, নাটক পাঠ করলে আমাদের শিশুদের মানসিক বিকাশের পাশাপাশি তাদের ভাষা দক্ষতাগুলোর অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটবে।

ছোটোগল্প

বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং প্রাণোচ্ছল শাখা হচ্ছে ছোটোগল্প। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত (Impression) একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য-কাহিনি যার অন্যতম বক্তব্য কোনও ঘটনা বা পরিবেশ কিংবা মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।" ছোটোগল্পের আকৃতিগত বিবেচনা মুখ্য নয়; বরং প্রকৃতিগত ও মর্মগত দিক বিচার করেই ছোটোগল্পকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা করা হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তরী কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতার অংশবিশেষ ছোটোগল্পের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যময়–

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ -

ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য

ছোটোগল্প লেখকের আত্মসচেতন সৃষ্টি। 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'এই পঙক্তিটির মধ্যে ছোটোগল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। এছাড়া ছোটোগল্পে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষণীয়–

ব্যঞ্জনাধর্মিতা: সাধারণত কবিতার ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার ব্যাপারটি লক্ষণীয় হলেও ছোটোগল্পেও এর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।বর্ণনাভঙ্গির স্বতন্ত্র প্রয়োগের জন্যই কখনো কখনো ছোটোগল্পের শব্দগুচ্ছ বা বাক্য তার অর্থকে ছাড়িয়ে গভীর ভাবব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

সুসংবদ্ধতা: ছোটোগল্পের ভাষা, চরিত্র ও ঘটনার বিন্যাস হয়ে থাকে সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো ঘটনা ও চরিত্রের স্থান ছোটোগল্পে একেবারেই থাকে না।

সংবেদনশীলতা: ছোটোগল্প জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পরূপ। এতে লেখকের সংবেদনশীল মানসিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে থাকে।

জীবনের অখন্ড অংশ: ছোটোগল্পের ক্যানভাসে মূর্ত হয় বৃহৎ জীবনপ্রবাহের একটি খণ্ডিত রসঘন মুহূর্ত। আর এ মুহূর্তটির বহমানতা হয়ে থাকে দ্রুতগতিসম্পন্ন।

চরম মুহূর্ত: নাটকের তৃতীয় অঙ্কে যেমন ঘটনার চরম উৎকর্ষ বা ক্লাইমেক্স রূপ পায়, ছোটোগল্পেও তেমনি একটি চরম মুহূর্ত লক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ে পাঠকের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে পড়ে পরবর্তী পরিণতি জানার প্রত্যাশায়।

আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি: এই বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টিগোচর হয় গল্পের শেষ পরিণতিতে। দৃশ্যত গল্পটি শেষ হয়ে গেলেও পাঠকের মনে একটি অতৃপ্তিবোধ থেকেই যায়। এরপর কী হলো, কী হতে পারে এ বিষয়ে পাঠক ভাবতে শুরু করে। বস্তুত এটিই ছোটোগল্পের সার্থক পরিণতি ও প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ছোটোগল্পের শ্রেণিবিভাগ

জীবনের বিচিত্র খণ্ডচিত্র নিয়ে ছোটোগল্পের ভুবন আবর্তিত বলে ছোটোগল্প স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যে বিন্যস্ত। এ কারণে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিকরণে ছোটোগল্পকে বিভাজন করা যায় না। আঙ্গিক বা বিষয়বস্তু বিবেচনায় ছোটোগল্পকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়–

১. রোমান্টিক প্রণয়ের গল্প, ২.সমাজসমস্যা ও সমাজসংকটধর্মী গল্প, ৩. দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক গল্প, ৪. প্রকৃতি ও মানবজীবন-সংক্রান্ত গল্প, ৫. রূপক বা সাংকেতিক গল্প, ৬. পরাবাস্তব বা অতিপ্রাকৃত বিষয়ক গল্প, ৭. জাদুবাস্তবতাধর্মী গল্প, ৮. ব্যঙ্গারস বা হাস্যরসাত্মক গল্প, ৯. ঐতিহাসিক বা কল্পবৈজ্ঞানিক গল্প, ১০. রহস্য বা গোয়েন্দা গল্প ইত্যাদি।

বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের উদ্ভব পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে। বাংলা গদ্যের বিকাশের সাথে যেহেতু বাংলা ছোটোগল্প সম্পর্কিত, সেহেতু বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের উদ্ভব হয় বিলম্বে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছোটো আকৃতির গল্প লিখলেও তাকে ছোটোগল্প বলা হয়নি। কারণ আকৃতিতে ছোটো হলেই তাকে ছোটোগল্প বলা যায় না, ছোটোগল্পের প্রকৃতিও ভিন্ন। প্রকৃতির দিক থেকে স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম সচেতনভাবে বাংলা ছোটোগল্প রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা ছোটোগল্পের সার্থকতম রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কেবল সংখ্যার দিক থেকে নয়, বিষয়বৈচিত্র্যে, ভাবসম্পদে ও আঙ্গিক নির্মাণে তিনি বিশ্বমানের ছোটোগল্পকার রূপে নন্দিত হয়েছেন। রবীন্দ্র অনুসারী গল্পকারদের হাতে অনেক গল্প রচিত হলেও ভিন্ন মাত্রা ও ভিন্ন মননে রচিত হয়েছে তিরিশোত্তর গল্পকারদের গল্পগুলো। সুগভীর জীবনদশর্ন ও জীবনাদর্শের প্রতিভাসিদ্ধ স্পর্শে তাঁদের গল্পগুলো উজ্জ্বল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় , বদ্ধুদেব বসু ,কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় অন্নদাশঙ্কর রায় , সৈয়দ মজুতবা আলী প্রমুখ বাংলা ছোটোগল্পের মান ও পরিধি ঋদ্ধ করেছেন।

প্রবন্ধ

‘প্রবন্ধ’শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় প্র+বন্ধ বা প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধন অনুসরণ করে গদ্যরীতিতে রচিত মননশীল রচনাকে প্রবন্ধ বলে অভিহিত করা যায়। প্রতিটি প্রবন্ধ সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক। যথেষ্ট প্রমাণ, উপযুক্ত তথ্য-তত্ত্ব প্রয়োগ করে ভাষার চিন্তায় সেই বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করাই হলো প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। শ্রীশচন্দ্র দাশ প্রবন্ধের সংজ্ঞায়ন করেছেন এভাবে ‘কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতনতামূলক নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধের ভাষা ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বৈচিত্র্য থাকিলেও ইহা সাধারণত গদ্যে এবং নাতিদীর্ঘ করিয়া লিখিতে হইবে।’

প্রবন্ধের শ্রেণিবিভাগ

প্রবন্ধ-সাহিত্যকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় (১) বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ ও (২) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।

১) বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ: বিষয়বস্তুর প্রাধান্যবস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের মূল বৈশিষ্ট্য। ইংরেজিতে বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকে Impersonal prose,Formal Essay,Discourse ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে পাঠশেষে বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে পাঠক কোনো বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি বিকাশের সুযোগ পায়। শ্রীশচন্দ্র দাশের মতে, 'বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে। অন্যদিকে মন্ময় বা 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ'জ্ঞানের বিষয়কে হাস্যরসমন্ডিত বা কোমলতা দান করে উপস্থাপন করা হয়। যুক্তি, উপাত্ত, প্রমাণ দ্বারা কোনো বিষয়ের প্রতিষ্ঠাই বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের লক্ষ্য। অর্থাৎ যুক্তি তর্কের বাইরে লেখকের নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে নেই।

২) ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ: ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে Essay Literature, Personal Essay, Informal Essayইত্যাদি নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ব্যক্তিহৃদয়ের প্রাধান্য ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের মূল বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ যুক্তি, তর্ক, তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণাদি ইত্যাদির তুলনায় ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে ব্যক্তি হৃদয়ের যুক্তি ও আবেগ, অনুভূতি, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পায়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ (Form), অর্থাৎ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদির সমতুল্য।

নাটক

কথোপকথনধর্মী রচনাই নাটক। নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ মাধ্যম। নাট্যকার ও আলংকারিকগণ নাটককে কাব্য সাহিত্যের অংশ ও শ্রেষ্ঠ ধারা বলে বিবেচনা করেছেন। দৃশ্য কাব্য ও শ্রাব্য কাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গামঞ্চে উপস্থাপিত গতিমান জীবনের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে নাটক। নাটক প্রধানত দৃশ্য কাব্য এবং এটা সকল প্রকার কাব্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য। অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশ সঙ্গাত কারণে বলেছেন, আর্থ-সামাজিক,রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মাধ্যমে রঙ্গামঞ্চে সক্রিয় ও দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপন করাই নাটক । থিম বা বিষবস্তুকে কেন্দ্র করে ঘটনার বিন্যাস ঘটে, ঘটনা বিন্যাসের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় প্রধান চরিত্র এবং অন্যান্য চরিত্র। নাটকের এই চরিত্র ও বিষয়বস্তুকে কার্যকর ও শিল্পরূপ দান করে সংলাপ।

নাটকের শ্রেণিবিভাগ

নাটক প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে, যেমন- ট্র্যাজেডি বা বিয়োগাত্মক নাটক ও কমেডি বা ব্যঙ্গাত্মক নাটক । ট্র্যাজেডি নাটকে জীবনের দুঃখময় উপলব্ধি এবং করুণ রসের প্রকাশ পায়। যেমন-মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর'। আর কমেডি নাটকে জীবনের আনন্দ, মিলনাত্মক ভাব ও হাস্য রসের প্রকাশ হয়। যেমন-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস'। ঐতিহাসিক নাটক যেখানে নাটকের বিষয়বস্তুঅতীত ইতিহাসের কোনও অধ্যায় অবলম্বন করে লিখিত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা সাজাহান, নুরজাহান ও চন্দ্রগুপ্ত সফল ঐতিহাসিক নাটক।

নাটকের অবয়ব ও উপাদান

নাটক লেখার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় সামনে রাখতে হয়। একে নাটকের কাঠামো বলা যেতে পারে। সনাতন নাট্যকারগণ নাটকের তিনটি ঐক্য মেনে চলতেন- সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য। প্রত্যেক নাটক সাধারণত পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত-প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন ও উপসংহার। তবে একাঙ্কিকা নাটকের প্রচলনও আছে। একাঙ্ক নাটক একটি অঙ্ক এবং বস্তুতপক্ষে একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটক। কাহিনিকে নাটকের দেহ বলা হয়। নাটকের থিম বা মূলভাবকে তুলে ধরার জন্য কাহিনি রচনা করা হয়। ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপসৃষ্টি করা হয়। কাহিনি রচনার জন্য নাট্যকারকে

জানতে হয় ঘটনা নির্বাচন, প্রারম্ভ, সময় ক্রম, দৃশ্যায়ন, ক্লাইমেক্স, সংলাপ সৃষ্টি। নাটকে চরিত্র ও সংলাপের সম্পর্ক, এবং চরিত্র ও সংলাপ কীভাবে কাহিনি গড়ে তোলে তা জানতে হয় নাট্যকারকে।

গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল

পাঠ পরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো: নমুনা

পর্যায়	শিখন-শেখানো ধাপ/কাজ
প্রথম পর্যায়	প্রাসঙ্গিক আলোচনা বা প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এমন উদাহরণ ব্যবহার করা; ছবি বিশ্লেষণ, পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি।
দ্বিতীয় পর্যায়	পাঠ পঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা।
তৃতীয় পর্যায়	শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা, সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের শুরু থেকে শিখন অবস্থা যাচাই করা।

১. গল্প ও প্রবন্ধ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল

পড়ার আগে

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করা
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা
- ছবি বিশ্লেষণ করানো
- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লেখা।

পড়ার সময়

- প্রমিত উচ্চারণে পাঠটি ২/৩ বার সরবে পড়া ও শব্দে আঙুল নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করতে বলা
- সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ/যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখানো। নির্ধারিত অংশের সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা
- প্রশ্ন করার মাধ্যমে পড়ার কাজ করানো। যেমন পাঠের সঙ্গে মিল রেখে বা পাঠের সূত্র ধরে প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারেন- এরপর কী হবে?
  এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে?
  পাঠ্যাংশে প্রতিটি ধাপে যাচাই করে করে সামনে এগিয়ে যেতে ও পাঠের সঙ্গে মিল রেখে উচ্চতর চিন্তা করার উপযোগী প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন- কেন এটা বা এসব হলো?
  কীভাবে হলো?
- শিক্ষার্থীদের পড়ার অনুশীলন করানো।

পড়ার পরে

- ভাষিককাজ নির্ভর শিখন-অনুশীলনী চর্চা করানো ও পাঠের সার-সংক্ষেপ করা বা করতে বলা।

২. কথোপকথনধর্মী পাঠের শিখন শেখানো কৌশল

পড়ার আগে

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করা
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা
- ছবি বিশ্লেষণ করানো
- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেওয়া।

পড়ার সময়

- প্রমিত উচ্চারণে স্বরভঙ্গির ওঠানামা বজায় রেখে পড়ে শোনোনো
- শব্দে আঙুল নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করানো
- পাঠের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য ২/৩ বার পড়া
- পাঠসংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ/যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করানো এবং পাঠের অংশের সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা
- প্রশ্ন করার মাধ্যমে গল্প পড়ার কাজ করানো
- প্রাসঙ্গিক কথোপকথন প্রেক্ষাপট তৈরি করা
- শিক্ষার্থীর পড়ার অনুশীলন করানো
- চরিত্র অনুযায়ী অনুশীলনদল গঠন করা এবং চরিত্র বন্টন করা। প্রত্যেককে চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত অংশটুকু পড়তে বলা। চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে কথোপকথন উপস্থাপন করতে বলা।

পড়ার পরে

- শিক্ষক ভাষিক কাজ (শব্দার্থ, বাক্যে প্রয়োগ, যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ, বিপরীত শব্দ, শূন্যস্থান পূরণ,মিলকরণ, এককথায় প্রকাশ, প্রশ্নোত্তর অনুশীলন ইত্যাদি) নির্ভর শিখন-অনুশীলনী চর্চা করানো।
- পাঠের সার-সংক্ষেপ করা বা করতে সহায়তা করা।

পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক

ছক পূরণের নির্দেশাবলি

- প্রথমে উপস্থাপিত পাঠ-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (পাঠের শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকগণের নিকট থেকে জেনে নিবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালনা করছেন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের বিভিন্ন দিকসমূহ ছকের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাঠের ধরন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) অনুযায়ী উপস্থাপিত পাঠের পাঠদান কৌশল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাঠ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট দিকসমূহ সম্পর্কে নোট নিবেন।

নির্ধারিত পাঠ পরিচালনার জন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

পর্যবেক্ষকের নাম		পাঠ উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম:
পাঠ উপস্থাপন শুরু		পাঠ উপস্থাপন শেষ:
পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল	সবল দিক	উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

সার্বিক মন্তব্য:

পর্যবেক্ষণের তারিখ:

গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন শেখানো কৌশল উপস্থাপন করা

পাঠ পরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো: নমুনা

পর্যায়	শিখন-শেখানো ধাপ/কাজ
প্রথম পর্যায়	প্রাসঙ্গিক আলোচনা/প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা/পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করা; ছবি বিশ্লেষণ, পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি।
দ্বিতীয় পর্যায়	পাঠ পঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা।
তৃতীয় পর্যায়	শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা, সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের শুরু থেকে শিখন অবস্থা যাচাই করা।

পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক

ছক পূরণের নির্দেশাবলি

- প্রথমে উপস্থাপিত পাঠ-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (পাঠের শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকগণের নিকট থেকে জেনে নিবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালনা করছেন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের বিভিন্ন দিকসমূহ ছকের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাঠের ধরন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) অনুযায়ী উপস্থাপিত পাঠের পাঠদান কৌশল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাঠ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট দিকসমূহ সম্পর্কে নোট নিবেন।

নির্ধারিত পাঠ পরিচালনার জন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

পর্যবেক্ষকের নাম:	পাঠ উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম:
পাঠ উপস্থাপন শুরুর সময়:	পাঠ উপস্থাপন শেষ:

পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল	সবল দিক	উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

সার্বিক মন্তব্য: (যদি থাকে)

পর্যবেক্ষণের তারিখ:

অধ্যায় ৭

মুক্ত লিখন শিখন

মুক্ত লিখনে শিক্ষার্থীদের নিজেদের জ্ঞান, অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু এই স্বাধীন প্রকাশকে অর্থবহ, সুস্পষ্ট এবং পাঠযোগ্য করে তুলতে যতি বা ছেদ-চিহ্ন ও শুদ্ধ বানানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুক্ত লিখনের উদ্দেশ্য হলো লেখায় স্বাভাবিকতা ও সৃজনশীলতা গড়ে তোলা। তবে ভাষার মৌলিক নিয়ম অমান্য করলে সেই লেখার ভাব ও সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হতে পারে। যতি চিহ্ন লেখাকে স্পষ্ট অর্থবোধক করতে সাহায্য করে। সঠিক স্থানে কমা, দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করলে পাঠক লেখকের ভাব, আবেগ ও বক্তব্য সহজে বুঝতে পারে। যতি চিহ্ন ছাড়া লেখার বাক্যগুলো একসাথে গাঁথা থাকায় অর্থ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। পাঠের গতি, বিরতি, আবেগের তীব্রতা এবং বক্তব্যের ওঠানামা সঠিকভাবে প্রকাশ পায় যতি চিহ্নের মাধ্যমে। ফলে লেখায় একটি ছন্দ, শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য বজায় থাকে। অন্যদিকে শুদ্ধ বানান লেখার মান বজায় রাখে এবং ভাষাকে সঠিক রূপে উপস্থাপন করে। ভুল বানান

অনেক সময় শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে দেয়, যার ফলে লেখকের মূল বক্তব্য বিকৃত হয়ে যেতে পারে। শুদ্ধ বানান ভাষার প্রতি শিক্ষার্থীর যত্ন, দায়বদ্ধতা এবং ভাষাশুদ্ধতার চর্চা নিশ্চিত করে। এটি শিক্ষার্থীর ভাষাবোধ, শব্দভান্ডার এবং লিখনশৈলী উন্নত করে যা ভবিষ্যতে একাডেমিক, পেশাগত এবং সৃজনশীল লেখালেখিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুক্ত লিখনে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ থাকলেও ভাষার শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য রক্ষায় বিরাম চিহ্ন ও শুদ্ধ বানানের যথাযথ প্রয়োগ অপরিহার্য। এগুলো লেখাকে স্পষ্ট, বোধগম্য, আকর্ষণীয় ও পাঠযোগ্য করে তোলে। তাই সৃজনশীল লিখনের বিকাশের পাশাপাশি ভাষার নিয়ম মেনে লেখার অভ্যাস তৈরিতে যতি চিহ্ন ও শুদ্ধ বানানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীগণ সৃজনশীল লেখা, অনুচ্ছেদ লেখা, বাংলা বানানের নিয়ম ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে পারবে।

সৃজনশীল লেখা

সৃজনশীল লেখা হলো এমন লেখা যেখানে লেখক নিজের মনের ভাব, কল্পনা ও অনুভূতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করে। এই লেখায় শুধু তথ্য দেওয়া হয় না বরং লেখকের চিন্তা, অনুভূতি ও কল্পনার মাধ্যমে লেখা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সৃজনশীল লেখায় নতুন ভাবনা ও সুন্দর ভাষার ব্যবহার থাকে যা পাঠকের মনে আনন্দ ও ভাবনার সৃষ্টি করে। যে লেখায় নিজের ভাবনা ও কল্পনা মিলিয়ে সুন্দরভাবে কিছু প্রকাশ করা হয় তাই সৃজনশীল লেখা।একজন শিক্ষার্থীর চিন্তা-ভাবনার লিখিত রূপ যা শিক্ষার্থী তার জানা আর কল্পনা থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করে। এই মনোময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সৃজনশীল হয়ে ওঠে। এভাবে শিক্ষার্থী চিন্তা ও চিত্ত প্রকাশে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর লেখক হয়ে ওঠে। শ্রেণি শিখনে সৃজনশীল লিখনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলার কৌশল শিক্ষককে জানতে হবে।

সৃজনশীল লেখার নিয়ম

- সৃজনশীল লেখা হলো কারো সহায়তা ছাড়াই লেখা;
- লেখায় নিজস্ব আবেগ, ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে হয়;
- এখানে নিজস্ব চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে হয়;
- বাক্যবিন্যাসেও থাকে নিজস্ব চিন্তার ফসল;
- নিজের কল্পনাশক্তির সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটাতে হয়;
- কোনো কিছুকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকাশ করতে হয়;
- সৃজনশীল লেখার জন্য নিজের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি প্রয়োজন;
- প্রচুর পঠন অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞানভান্ডার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;
- লেখার প্রতিটি স্তরে থাকবে নিজের প্রতিফলন।

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ হলো একটিমাত্র বিষয়ে কতকগুলো সুসংবদ্ধ বাক্যের সমষ্টি। অনুচ্ছেদের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য-একটিমাত্র ভাব বা বিষয় এবং একটি স্বাভাবিক অনুক্রম ও যথাযথ ধারাবাহিকতা।

অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য

বিষয়বস্তু অনুসারে অনুচ্ছেদ তিন ধরনের হতে পারে যেমন: বর্ণনামূলক, ঘটনামূলক ও চিন্তামূলক। অন্যদিকে লেখা শেখানোর কৌশলের দিক বিবেচনা করলে আমরা ভিন্ন ধরনের অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য পাই।

প্রথমত 'শূন্যস্থান পূরণ' প্রক্রিয়ায় অনুচ্ছেদ লেখা। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক প্রথমে পশু, পাখি বা অন্য কোনো বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারেন-যা শুধু শিক্ষকই জানবেন। এরপর সেই অনুচ্ছেদ থেকে কিছু বিশেষ শব্দ তুলে নিয়ে ঐ জায়গা ফাঁকা করে দেবেন। এবার শিক্ষক শূন্যস্থানযুক্ত অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের নিকট সরবরাহ করবেন এবং ঐ ফাঁকা স্থানে প্রকৃত/ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে সহায়তা করবেন। **দ্বিতীয়ত** কোনো ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখা। যেমন:

আমার নাম উমাইরাহ্। আমার বয়স আট বছর। আমি বাবলাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী। মায়ের নাম নাফিসা পারভীন। মা একজন শিক্ষক। আমরা দুই বোন।

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের জন্য প্রযোজ্য বয়স, নাম ইত্যাদি শব্দ বা তথ্য বসিয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এ ধরনের লিখনকে 'সমান্তরাল অনুচ্ছেদ লিখন'ও বলা হয়। **তৃতীয়ত** কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে শিশুর নিকট থেকে শিক্ষক কিছু ইঙ্গিতময় শব্দ শনাক্ত করিয়ে নেন। শিক্ষক শিশুদের শব্দের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনুচ্ছেদ লিখতে সহায়তা করেন। যেমন: 'গরু' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখার জন্য 'ভূমিকা', ' শরীরের রং', 'খাদ্য', 'উপকারিতা' ইত্যাদি এ ধরনের শব্দগুলো নির্বাচন করে দেন।

অনুচ্ছেদ লেখা শেখানোর কৌশল

শিশুদের অনুচ্ছেদ লিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষককে কতিপয় কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন:

- বোর্ডে কোনো বিষয়ের মূল শব্দ লেখা;
- বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলো কী হতে পারে তা শিশুদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা;
- বোর্ডে শব্দগুলো লেখা;
- শব্দগুলোর পর্যায়ক্রম ঠিক করা;
- প্রয়োজনে কতিপয় শব্দ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া;
- খসড়া অনুচ্ছেদ লিখতে বলা;
- প্রতিটি লেখার বানান, ভাষা, ধারণা, তথ্য ইত্যাদির উপর ফলাবর্তন দেওয়া;
- ফলাবর্তনের আলোকে পুনরায় লিখতে বলা;
- নিরীক্ষণ করা ও মন্তব্য প্রদান;

মনে রাখা আবশ্যক, এ ধরনের কাজে শিশুর জন্য প্রয়োজন সহায়তা প্রদান ও অনুশীলন। তাই দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি।

অনুচ্ছেদ লেখার কতিপয় নিয়ম

- একটি প্যারায় লিখতে হবে;
- তথ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে;

- একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না;
- দশ/বারোটির বেশি বাক্য না লেখাই ভালো।

বাংলা বানানের নিয়ম

বাংলা বানানে আমাদের মধ্যে প্রায়ই উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। কাঠিন্যের দোহাই দিয়ে বানানে বিশৃঙ্খলা দিন দিন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। উনিশ শতকে বাংলা বানানে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা শুরু হলেও আজও কাঙ্ক্ষিত সুফল আসেনি।

লেখার সময় কয়েকটি বিষয়ের ওপর অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। লেখার সময় বানান ভুল হলে যথাযথ ভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি শব্দগত ভুলের কারণে বাক্যের অর্থেরও বিভ্রাট ঘটতে পারে। খাতায় কিংবা বোর্ডে লেখার সময় বানানের প্রতি যত্নবান হতে হয়। লেখা দেখতে সুন্দর ও শুদ্ধ বানান হলে পড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। হাতের লেখা অস্পষ্ট ও বানান ভুল হলে সে লেখা পড়া দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। পড়ার প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হয়। অন্যদিকে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্য সঠিকভাবে যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার হওয়া আবশ্যক। বিরতি দেওয়ার জন্য কিংবা উচ্ছ্বাস, বিষাদ, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষার নির্ধারিত যতিচিহ্নের ব্যবহাররীতি প্রয়োগ আবশ্যক।

প্রমিত বাংলা বানানের গুরুত্ব

'বানান' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বর্ণন' শব্দ থেকে। ভাষার লিখনপ্রণালি ও প্রকাশরীতির শুদ্ধতার জন্য প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বানানরীতি থাকা প্রয়োজন। বাংলা বানানের প্রমিতরীতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় একই শব্দের বানান করতে গিয়ে একেকজন একেক রকম বর্ণ ব্যবহার করে থাকেন। এতে ভাষার গাম্ভীর্য, সৌন্দর্য হানি হয়। যা একটি ভাষার জন্য কখনোই ভালো নয়। এজন্য আমাদের সকলেরই প্রমিত বাংলা বানান সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা এবং শুদ্ধ ভাষা চর্চা করা প্রয়োজন।

বানান-দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

আমরা যখন লিখি তখন নির্দিষ্ট বাগধ্বনিকে প্রচলিত বানানে সাজিয়ে প্রকাশ করি। বানান সবচেয়ে সহজ হতো, যদি এক একটি বাগধ্বনির জন্য একটি করে হরফ অথবা যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার থাকত। কিন্তু বাংলা ভাষায় একই ধ্বনির একাধিক বানান রয়েছে এবং একই রকমের বানান আবার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ পায়। প্রচলিত বানানের সঙ্গে উচ্চারণের এই যে অসংগতি, তা গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার অতীত ইতিহাস ও উচ্চারণ পরিবর্তনের ধারায়। যদিও কালক্রমে এবং ধীরগতিতে বানানের কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, তবু ইচ্ছে করলেই উচ্চারণ-সংগত বানান-রীতি প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে এক এক এলাকার উচ্চারণ-বিভিন্নতাকে বানানে ঠাই দেওয়ার প্রশ্ন আসতে পারে। তাতে বানান-বিভিন্নতা আরও বেড়ে যাবে। আবার পিতামহ, পিতা ও পুত্রের উচ্চারণে যে স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে তাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হলে বার বার বানান পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়বে। উচ্চারণ-সংগত বানান প্রবর্তনের আরও সমস্যা আছে। প্রতিটি বানানেরই আলাদা ইতিহাস আছে। অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে তা গড়ে ওঠে। উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান চালু করলে সে ইতিহাস হারিয়ে যাবে চিরতরে। উপরন্তু, সহজ করার জন্য হঠাৎ করে বানান আমূল পরিবর্তন করা হলে তা অতীতের হাতে লেখা অসংখ্য পুঁথি ও মুদ্রিত বইপত্র পাঠের ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। তাই কঠিন মনে হলেও প্রচলিত বানান ও তার নিয়ম আমাদের মেনে নিতে হবে, শিখতে হবে।

শব্দের বানান শুদ্ধ করে লিখতে পারা শিক্ষিত লোকের একটা প্রয়োজনীয় দক্ষতা। কেউ যদি নিয়মিত বানান ভুল করেন তবে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে এবং তাঁর মর্যাদাও কিছুটা খাটো হয়ে যায়। আরও মজার ব্যাপার, যারা নিজেদের বানানের ব্যাপারে অসতর্ক তারাও অন্যের লেখায় বানান ভুল দেখলে চট করে সমালোচনা করতে ছাড়েন না। বস্তুত, যে-কোনো লেখার বানান শুদ্ধ হওয়া চাই। তা না হলে লেখা যেমন যথাযোগ্য মানের বলে বিবেচিত হয় না তেমনি ভুল বানান অনেক ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্যকেও বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিতে পারে। তাই, শুদ্ধ বানান যে কোনো লেখা ও লেখকের জন্য একটি অপরিহার্য গুণ। তবে এ কথাও মানতে হবে যে, বানানের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ নির্ভুলতা আয়ত্ত করা খুব সহজ নয়। আর সে জন্যই আমাদের সবার প্রচেষ্টা হওয়া উচিত, যতটা সম্ভব বানান ভুল পরিহার করা। এটি তেমন কঠিন কাজ নয়। প্রয়োজনমতো সময় দিয়ে নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়ে সহজে এ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন সম্ভব।

প্রমিত বাংলা বানানের উল্লেখযোগ্য নিয়ম

১. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার-কার চিহ্ন ই-কার উ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, পঞ্জি, ধূলি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

২. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

৩. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন: অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। তবে অঙ্ক, অঙ্গা, আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গা, বঙ্গা, লঙ্ঘন, সঙ্গা, সঙ্গী প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ নয় বলে ঙ স্থানে ং হবে না।

৪. সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের-কার চিহ্ন ি এবং ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

যেমন: গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, উনিশ, উনচল্লিশ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে— আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি।

তবে কোনো কোনো স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার দেওয়া যেতে পারে। যেমন: রানী, পরী, গাভী। সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: কী করছ? কী পড়ো? কী যে করি! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে। কী আনন্দ! কী দুরাশা! অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে।

যেমন: তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী। পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

৫. তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-য়ের নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন। তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্য বর্ণ ণ হয়, যেমন : কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগেও কেবল ন হবে।

৬. তৎসম শব্দে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এ-ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না। বিদেশি মূল শব্দে শ, স-য়ের যে ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন : সাল (=বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, বেহেশ্ত, নাশতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূমে শ দিয়ে লেখা হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন : বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশী শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন : স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিও, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট।

৭. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী S বর্ণ বা ধ্বনির জন্য **স** এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য **শ** ব্যবহৃত হবে।

৮. বাংলায় এ বা এ-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি, ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা এ-কার হবে। যেমন : দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে। বিদেশি শব্দ অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা এ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : এন্ড (end), নেট, বেড, শেড। বিদেশি শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা অ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : অ্যান্ড (and), অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট। তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যার অ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিচিত। যেমন : ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে অ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

৯. বাংলা অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে অনেকে যথেচ্ছভাবে ও-কার ব্যবহার করছেন। যেমন : ছিলো, করলো, বলতো, কোরছ, হোলে, যেনো, কেনো (কী জন্য), ইত্যাদি ও-কারযুক্ত বানান লেখা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অনুরূপ ও-কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ও-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে। যেমন : ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো।

১০. তৎসম শব্দে ং এবং ঙ যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ওই নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং, সং, পালং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ-দুটি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।

১১. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ। পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন: দুস্থ, নিস্পৃহ।

১২. আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন: করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

১৩. বাংলায় বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষণ সম্ভবই নয়। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিন্ট, স্প্রিং ইত্যাদি।

১৪. হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, বললেন, শখ, টাক, টক। তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : উহ্, যাহ্, বাহ্। যদি অর্থের বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : বল্ ।

১৫. উর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: করল (করিল), বলে (বলিয়া), দুজন (দুইজন), চাল (চাউল), আল (আইল)।

১৬. যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলির স্পষ্ট রূপ দিতে হবে। তার জন্য কতকগুলি স্বরচিহ্নকে বর্ণের নিচে বসাতে হবে। তবে ক্ষ, জ্ঞ, ঞ্জ, ষ্ণ, হ্ম, ভ্র, হু-এইসব ক্ষেত্রে পরিচিত যুক্ত-রূপ অপরিবর্তিত থাকবে। কেননা তা বিশ্লিষ্ট করলে উচ্চারণ বিকৃতির আশঙ্কা থাকে।

১৭. সমাসবদ্ধ পদগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন: সংবাদপত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব, পূর্বপরিচিত, রবিবার, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বারবার, বিষাদমন্ডিত, সমস্যাপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, দৃঢ়সঙ্কল্প, সংযতবাক, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি, কখনো একটির বেশি হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্য-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু।

১৮. আধুনিক বাংলা বানানে শব্দ সংক্ষেপে ং (অনুস্বার) ও ঃ (বিসর্গ) বর্জনীয়। যেমন: নং, তাং, প্রাং, সাং, কোং, গং এর পরিবর্তে পূর্ণরুপ নম্বর, তারিখ, প্রামাণিক, সাকিন, কোম্পানি, গয়রহ লেখা বাঞ্ছনীয়। একইভাবে শব্দ সংক্ষেপে ঃ (বিসর্গ) এর পরিবর্তে বিন্দু (.)-এর ব্যবহার করতে হবে। যেমন: মোঃ, মোসাঃ, ডাঃ, ডঃ, সাঃ, অবঃ-এর পরিবর্তে মো., মোসা., ডা., ড., সা., অব. ব্যাকরণসম্মত।

যতি বা ছেদ-চিহ্ন

কথা বলার সময় সব বাক্য একযোগে না বলে থেমে বলতে হয়। এতে উচ্ছ্বাস, আবেগ, বিষাদ ইত্যাদি প্রকাশ করতে যতি বা ছেদ-চিহ্নের প্রয়োজন হয়। বাক্যে যথাযথ যতি চিহ্ন না ব্যবহার করলে অর্থের অসঙ্গতি তৈরি হতে পারে। তাছাড়া শ্রোতাকে কথাগুলো বোঝার সময়ও দিতে হয়। লেখার বেলায়ও তেমনি পাঠককে বোঝাতে মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হয়- কথা থামাতে, শ্বাস নেবার জন্য। যতিচিহ্ন ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হয়। লিখিত বাক্যে অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে মানুষের আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি ব্যক্ত করার জন্য যে চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয় তাই যতিচিহ্ন।

আজকের মতো প্রাচীন বাংলায় কোনো যতি চিহ্ন ছিল না। এক দাঁড়ি (।) এবং দুই (।।) ছিল। এক দাঁড়ি দিয়ে কমার মতো অল্প বিরাম এবং দুই দাঁড়ি দিয়ে অধিক বিরাম বোঝাতো।

বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদ-চিহ্নের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্য বা কবিতা কোথাও যথাযথ যতি চিহ্ন ব্যবহার হতো না। শুধু পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়িজ্ঞাপক চিহ্নটি (এক দাঁড়ি (।) / দুই দাঁড়ি (।।)) ছিল। বিদ্যাসাগর গদ্য রচনাকালে বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হন। তখন তিনি গদ্যের মধ্যে শ্বাসপর্ব ও অর্থপর্ব ভাগ করে ইংরেজি গদ্য থেকে সবগুলো যতি বা ছেদ-চিহ্ন বাংলায় ব্যবহার করেন। যেহেতু বাংলায় পূর্ণচ্ছেদ জ্ঞাপক দাঁড়ি (।) আগেই ছিল, সেহেতু তিনি ফুলস্টপ (.) গ্রহণ না-করে বাংলার নিজস্ব সম্পদ দাঁড়ি (।) কেই রক্ষা করলেন। বিদ্যাসাগর যে যতি-চিহ্নসমূহ বাংলায় ব্যবহার করেন আজও সবগুলোর বাংলা নাম হয়নি। কোনোটির বাংলা নাম হলেও তা ইংরেজি নামেই বেশি পরিচিত।

নিচে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যতি বা ছেদ-চিহ্নের নাম, আকৃতি নির্দেশ করা হলো: বাংলা ভাষায় ২০টির মতো যতি-চিহ্ন রয়েছে। এদের মধ্যে বাক্যের আগে ব্যবহার্য ৬টি, বাক্য শেষে ব্যবহার্য যতি-চিহ্ন ৪টি এবং বাক্যের ভিতরে ব্যবহার্য ১০টি।

বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত যতি-চিহ্নসমূহ ব্যবহৃত হয়

যতিচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতিকাল
কমা বা পাদচ্ছেদ	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	।	এক সেকেন্ড।
প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড।
বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড।

যতিচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতিকাল
কোলন	:	এক সেকেন্ড।
ড্যাশ	—	এক সেকেন্ড।
কোলন ড্যাশ	:-	এক সেকেন্ড।
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই।
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই।
একক উদ্ধৃতি চিহ্ন	' '	'এক' উচ্চরণে যে সময় লাগে।
যুগল উদ্ধৃতি চিহ্ন	“ ”	'এক' উচ্চরণে যে সময় লাগে।
ব্র্যাকেট (বন্ধনি চিহ্ন)	(), { }, [ ]	থামার প্রয়োজন নেই।
ধাতু দ্যোতক চিহ্ন	√	থামার প্রয়োজন নেই।
পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন	<	থামার প্রয়োজন নেই।
পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন	>	থামার প্রয়োজন নেই।
সমান চিহ্ন	=	থামার প্রয়োজন নেই।
ত্রিবিন্দু বা পূর্ণলোপ	...	থামার প্রয়োজন নেই।
একবিন্দু বা শব্দসংক্ষেপ	.	থামার প্রয়োজন নেই।
বিকল্প চিহ্ন	/	থামার প্রয়োজন নেই।

যতি বা ছেদ-চিহ্ন ব্যবহার

কমা বা পাদচ্ছেদ (,) : ক. সম্বোধন পদের পরে কমা বসে। যেমন: স্যার, আমাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেবেন?

খ. সমজাতীয় পদ পাশাপাশি বসলে তাদের পর কমা বসে।

যেমন: হাঁস, মুরগি, ভেড়া, ছাগল গৃহপালিত পশু।

গ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খন্ড বাক্যের পরে কমা বসে।

যেমন: লেখাপড়া করে যে, বাড়ি গাড়ি করে সে।

ঘ. তারিখ লেখার সময় মাস ও দিনের পর কমা বসে।

যেমন: শনিবার, ১০ই মে, ২০২১ সাল।

ঙ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসে ।

যেমন : ১০৩, মিরপুর-১, ঢাকা।

সেমিকোলন (;) : ক.কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির জন্য সেমিকোলন বসে।

খ. কমার বারংবার ব্যবহারের পর কিন্তু দাঁড়ি ব্যবহারের আগে সেমিকোলন বসে।

গ. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি স্বাধীন বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে।

যেমন: তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে।

দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।): বাক্যের অর্থের পরিসমাপ্তি বোঝাতে। যেমন: রহিম ঘরে ঢুকে করুণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাইল ।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?): বাক্যে কোন জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা বুঝাতে । যেমন : তুমি কি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করেছ?

বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন (!): হৃদয়ের বিস্ময় ও আবেগ প্রকাশার্থে। অবশ্য সম্বোধনে আবেগ বোঝালেও এই চিহ্ন বসে।

যেমন: আহ! কী করুণ দৃশ্য।

কোলন (:): বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে প্রাসঙ্গিক অন্য তথ্য জ্ঞাপনের সময় ।যেমন : কমিটিতে সিদ্ধান্ত হল : আগামী মাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ড্যাশ (-): ক. কোনো উদাহরণ, দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বুঝাতে।যেমন : গঠনানুসারে শব্দ দুই প্রকার – ১। মৌলিক শব্দ ২। সাধিত শব্দ ।খ. পৃথক ভাবাপন্ন একাধিক বাক্য এক বাক্যে স্থাপনের সময় । যেমন : তোমরা কায়িক শ্রম কর-এতে তোমাদের সম্মান যাবে না-বাড়বে ।

কোলনড্যাশ (:-): পূর্বে কোলন খুব কম ব্যবহার হতো, বর্তমানে কোলনড্যাশ কম ব্যবহার হয়। কোলন ও কোলনড্যাশের ব্যবহার একই হওয়ার কারণে কোলনড্যাশের জায়গা দখল করেছে কোলন বা ড্যাশ। এজন্য অনেকে কোলনড্যাশকে পৃথক যতি-চিহ্ন হিসেবে স্বীকার করেন না।

হাইফেন (-): একাধিক শব্দ বা পদ সংযোগ দেবার জন্য হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন : আমার মা-বাবা গ্রামে থাকেন।

ইলেক বা লোপ চিহ্ন ('): এক বর্ণ বা একাধিক বর্ণের লোপ বোঝাতে।যেমন : দুরন্ত বেগে যাচ্ছে কা'রা (এখানে ‘কা'রা’ কাহারা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে ‘হা’ লোপ পেয়েছে।)

একক উদ্ধৃতি চিহ্ন (‘ ’):অন্যের কথা উদ্ধৃত করতে হলে কিংবা কোনো কথায় পাঠকের মনোযোগ দাবি করতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের প্রযোজন পড়ে। যেমন: পা টিপে-টিপে দুপুরবেলা উকিলদ্দি এসে হাজির। বললে,‘কই গো বিবিজান। দেখো এসে কী এনেছি।’

যুগল বা জোড় উদ্ধৃতি চিহ্ন (" "): যেখানে কেবল এক ধরনের উদ্ধৃতিচিহ্নেরই প্রয়োজন সেখানে এক-উদ্ধৃতিচিহ্ন বা জোড় উদ্ধৃতচিহ্ন-যেকোনো একটি ব্যবহার করলেই চলে। একজনের বক্তব্যের ভেতরে যদি ভিন্ন জনের বক্তব্য উদ্ধৃত হয় তা হলে প্রধান বক্তব্যের ক্ষেত্রে যুগল বা জোড়-উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং তার অন্তর্গত উদ্ধৃতিতে এক-উদ্ধৃতি লাগবে। যেমন: হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, “কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে কী বলিব?” বাবা বলিলেন, “মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো, ‘আমি জানি না-আমার শাশুড়ি জানেন।’।”

ব্র্যাকেট (বন্ধনি চিহ্ন) (( ), { }, [ ]) : কোনো বক্তব্যকে বিশদ করতে হলে বন্ধনির প্রয়োজন পড়ে। যেমন: তিনি উচ্চপদস্থ আমলা ছিলেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে (তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়) কাজ করতেন।

ধাতু দ্যোতক চিহ্ন (√): ক্রিয়ার মূল বা ধাতু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন (<): পরবর্তী থেকে পূর্ববর্তী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন (>): পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

সমান চিহ্ন (=): সমন্বয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ত্রিবিন্দু বা পূর্ণলোপ (...): বাক্যের কোনো অংশ বা শব্দাবলি বিলোপ বা উল্লেখ না করার প্রয়োজনে ।

একবিন্দু বা শব্দসংক্ষেপ (.): কোনো শব্দ সংক্ষেপ করতে হলে ব্যবহার হয়। যেমন: ডক্টর > ড.; মোহম্মদ > মো. ।

বিকল্পচিহ্ন (/): বিকল্পচিহ্ন প্রয়োগ করে বোঝানো হয়- দুই বা ততোধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে যে কোনোটি হতে পারে। অর্থাৎ, এই চিহ্নের অর্থ হচ্ছে ‘অথবা’। যেমন: ঘরের মধ্যে বেশি লোক নেই তো-বড়ো জোর আট/দশ জন হবে।

অধ্যায় ৮

বাংলা ভাষাদক্ষতা মূল্যায়ন

শোনার মাধ্যমে শেখা শুরু হয়। এজন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শোনা দক্ষতা গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করা জরুরি। শিক্ষক কী আলোচনা করছেন, পাঠের তাৎপর্য কী, কোন নির্দেশনা কীভাবে পালন করতে হবে-এসব অনুসরণীয় বিষয় প্রথমে শিক্ষার্থীকে শুনে বুঝতে হয়। তাই শোনা দক্ষতা দুর্বল হলে শিখন ঘাটতি রয়ে যায়। অপরদিকে বলা দক্ষতা শুধু ভাষা শিক্ষার একটি অংশ নয়-এটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব , আত্মমর্যাদা, যোগাযোগ ক্ষমতা ও সামাজিক দক্ষতার ভিত্তি তৈরি করে। বলা দক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক বুঝতে পারেন শিক্ষার্থী কতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাবলীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে, শব্দচয়ন ঠিক আছে কি না এবং কথোপকথনের শিষ্টাচার, পালা বদল, ভদ্রতা, স্বরভঙ্গি-কতটা অনুসরণ করছে। পড়া দক্ষতা শেখার সব ক্ষেত্রের ভিত্তি। একজন শিক্ষার্থী কতটা বুঝে পড়তে পারে, কত দ্রুত তথ্য আহরণ করতে পারে এবং পাঠের মূল ধারণা অনুধাবন পারে-এসব কিছুর ওপর তার সামগ্রিক অর্জন অগ্রগতি নির্ভর করে। আর লেখা ভাব প্রকাশের সবচেয়ে সংগঠিত ও স্থায়ী মাধ্যম। একজন শিক্ষার্থী কতটা দক্ষভাবে নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে পারে, কতটা সঠিক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতে পারে এবং কোন বিষয়কে কীভাবে উপস্থাপন করতে পারে-এর সবকিছুই লেখা দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। এ অধ্যায়ে শ্রেণিকক্ষে ভাষার চারটি দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া ও লেখা কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, নমুনা টুলস ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

শ্রেণিকক্ষে শোনা দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

শোনা দক্ষতা কতটা মজবুত, নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক সহজেই বুঝতে পারেন কোন শিক্ষার্থী পাঠ ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারছে এবং কে পারছে না। তাতে চাহিদাভিত্তিক বিশেষ সহায়তা প্রদান করা সহজ হয়। শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন। তাই শোনা দক্ষতা মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখার অভ্যাসও গড়ে তোলে। শিক্ষার্থী বুঝতে পারে শিক্ষক তাকে প্রশ্ন করতে পারেন-তাই সে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ দক্ষতাও অনেকটা শোনার ওপর নির্ভরশীল। ভালোভাবে শুনতে না পারলে আলোচনায় অংশগ্রহণ, জবাব দেওয়া বা নিজের মত প্রকাশ করা-কিছুই সঠিকভাবে হয় না। শিক্ষকের নির্দেশিত কাজ, অনুশীলন, আলোচনা বা বাড়ির কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সঠিকভাবে শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা অপরিহার্য। বিদ্যালয়ে এ দক্ষতার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্যও ভালো শ্রোতা হিসেবে তুলবে।

শোনা দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ:

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	নমুনা টুলস	মূল্যায়ন প্রক্রিয়া
ক. বিভিন্ন রকম ধ্বনি ও শব্দ শুনে আলাদা করতে পারা। **খ.**মনোযোগ	১ম থেকে ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শোনা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিবেচনাধীন বিষয়- **ক.** শিক্ষার্থী	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	**ক.** মৌখিক চেকলিস্ট: বর্ণ/ শব্দ/ বাক্য তালিকা যেমন শব্দ তালিকা- অজ, আম, অলি, ইলিশ **খ.** পর্যবেক্ষণ	**ক:** শিক্ষক কোনো ধ্বনি/বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন অথবা সিডি হতে শোনাবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিকভাবে লিখতে বা বলতে পারল কি না শিক্ষক তা যাচাই করে মূল্যায়ন করবেন। **খ:** শিক্ষক কোনো একটি ছড়া নিজে এক লাইন বাদ দিয়ে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা তার এই ইচ্ছাকৃত ভুল ধরতে পারলে বুঝতে পারা যাবে

ও ধৈর্য সহকারে শুনতে পারা **গ.** শুনে বুঝতে পারা **(ক** শুধু ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য **খ ও গ** সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।)	বিভিন্ন রকম শব্দ শুনে ধ্বনি এবং বাক্য শুনে শব্দ আলাদা করতে পারছে কি না **খ.** শিক্ষার্থী মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে শুনছে কি না **গ.** শিক্ষার্থী শুনে বুঝতে পারছে কি না।		চেকলিস্ট: আদেশমূলক বাক্য, যেমন দাঁড়াও, এগিয়ে এসো, ছড়া আবৃত্তি যেমন, আতা গাছে তোতা পাখি **গ.** প্রশ্নপত্র বা চিত্র: প্রশ্ন তালিকা যেমন, রাজার কয়জন কন্যা ছিল? তার ছোট কন্যার নাম কী? বড় কন্যা তাকে কী রকম ভালোবাসে?	তাদের মনোযোগ ছিল। **খ-২:** পাঁচ/ছয়জনের গ্রুপ করে চেইন ড্রিলের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পরের লাইন আবৃত্তি করতে বলবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও ধৈর্যসহ শোনার দক্ষতা যাচাই করা যাবে। **গ:** শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিংবা অডিও-ভিডিও টুল ব্যবহার করে একটি শ্রুতি সকল শিক্ষার্থীদের শুনিয়ে তারা কী বুঝলো তা শিক্ষার্থীদের লিখতে দিয়ে, কিংবা বলতে দিয়ে শুনে বুঝতে পারার দক্ষতা যাচাই করতে পারেন।

শ্রেণিকক্ষে বলা দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

একজন শিক্ষার্থীর বলা দক্ষতা দুর্বল হলে সে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ নিতে সংকোচবোধ করে, নিজের ভাব প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং দলগত কাজেও পিছিয়ে পড়ে। তাই বলা দক্ষতার মূল্যায়ন তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে, শিক্ষার্থীদের ভাষা ব্যবহারের প্রয়োগক্ষমতা যাচাই করে। কথা বলার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শেখা শব্দ, ব্যাকরণ ও ধারণা বাস্তবে ব্যবহার করতে শেখে। একইসঙ্গে যুক্তি উপস্থাপন, প্রশ্ন করা, ব্যাখ্যা দেওয়া ও মতামত দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলে-যা তাদের সমালোচনামূলক চিন্তা উন্নত করে।

বলা দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ:

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	নমুনা টুলস	মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

ক. স্পষ্টতা, শুদ্ধতা ও প্রমিত উচ্চারণ, **খ.** শ্রবণযোগ্যতা ও শুদ্ধ উচ্চারণে কথোপকথন, **গ.** প্রশ্ন করা, অনুভূতি ব্যক্ত ও বর্ণনা করা **ঘ.** বাচনভঙ্গি **ঙ.** প্রাসঙ্গিকতা (ক,খ,গ ও ঘ ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ঙ শুধু ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।)	১ম থেকে ৩য় শেণির শিক্ষার্থীর বলা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিবেচনাধীন বিষয় হলো- **ক.** শিক্ষার্থী স্পষ্ট, শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে কি না, **খ.** শ্রবণযোগ্য স্বর এবং শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারছে কি না এবং শ্রেণি কার্যক্রমে কথোপকথনে অংশ নিচ্ছে কি না, **গ.** শিক্ষার্থী প্রশ্ন করছে কি না, অনুভূতি ব্যক্ত করতে এবং কোনো বিষয় বর্ণনা করতে পারছে কি না, **ঘ.** বাচনভঙ্গি যথাযথ কি না, **ঙ.** বলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখছে কি না।	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	**ক.** নির্দেশনা/চেকলিস্ট: বর্ণ তালিকা যেমন: অ, আ, ই, ঈ শব্দ তালিকা যেমন: অজ, আম, ইলিশ, অলি বাক্য তালিকা যেমন: অজ আসে, আম খাই । **খ.** পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: নির্ধারিত ছড়া বা গল্পের অংশবিশেষ **গ.** প্রশ্নপত্র, চিত্র	**ক-১:** শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে এক বা একাধিক বর্ণ/শব্দ/বাক্য বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে বলবে। **ক-২:** শিক্ষার্থী নিজের বা চারপাশের কোনো বিষয় সম্পর্কে বলবে। **খ.** শিক্ষার্থী কবিতা সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে আবৃত্তি করবে এবং শিক্ষক তার অনুভূতি ও বাচনভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করবেন। **গ-১:** শিক্ষক কোনো পাঠ্যাংশ পড়তে দিয়ে তার উপরে কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী জবাব দেবে। এভাবে শিক্ষার্থীর বলা দক্ষতা মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে। **গ-২:** শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সে সম্পর্কে বলতে বলবেন।

শ্রেণিকক্ষে পড়া দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

পড়া দক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক বুঝতে পরেন শিক্ষার্থী কি শুধু ডিকোড (পাঠোদ্ধার) করতে পারছে, নাকি পাঠের মূলভাবও বুঝতে পারছে। যদি কোনো শিক্ষার্থীর পড়া বোঝার ক্ষমতা দুর্বল হয়, তবে সে অন্যান্য বিষয়েও পিছিয়ে পড়তে পারে, কারণ প্রায় সব পাঠ্যসূচিতেই পাঠ বোঝার ক্ষমতা প্রয়োজন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণ, বিরামচিহ্নের ব্যবহার ও স্বরভঙ্গি সঠিক কি না তা নির্ণয়ও করা যায় পড়া দক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে। শিক্ষক এতে সহজেই শিক্ষার্থীর ভুল উচ্চারণ, শব্দ চিনতে সমস্যা, ধীরগতিতে পড়া বা মূল বক্তব্য ধরতে অক্ষমতা চিহ্নিত করতে পারেন। ফলে কার্যকর সহায়তা দেওয়া সম্ভব হয়।

পড়া দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ

ক. ডিকোডিং (পাঠোদ্ধার) **খ.** শব্দ ভান্ডার **গ.** ব্যাকরণ **ঘ.** পড়ে বুঝতে পারা (১ম - ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য)	১ম থেকে ৩য় শেণির শিক্ষার্থীর পড়া দক্ষতা যাচাইয়ের বিবেচনাধীন বিষয় হলো- **ক.** শিক্ষার্থীর পাঠ- সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা সমমানের বিষয় সরবে সঠিক বানান ও উচ্চারণে পড়তে পারছে কি না এবং নীরবে পড়ে তার মূল বিষয় /ভাবার্থ বুঝতে পারছে কি না। **খ.** শিক্ষার্থীর পাঠ- সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা সমমানের বিষয় নীরবে পড়ে শব্দ / বাক্যের অর্থ বুঝতে পারছে কি না। **গ.** শিক্ষার্থীরা পাঠ- সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা সমমানের বিষয়বস্তু পড়ে বাক্যগঠন করতে পারছে কি না।	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	**ক.** মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট: নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন: বাগানের চারপাশে বেড়া--- সাদা ফুল ঝরে পড়ে। **খ.** পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন- বাগানের চারপাশে বেড়া ...সাদা ফুল ঝরে পড়ে। **গ.** প্রশ্নপত্র, চিত্র: বিপরীত শব্দ যেমন: মা, রাত সমার্থক -শব্দ: যেমন চাঁদ, ধরণি	**ক.** শিক্ষক শিক্ষাথীদের পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত কোনো পাঠ্যাংশ/পড়তে দেবেন এবং তার ওপর মৌখিক বা লিখিত প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থী সে প্রশ্নের মৌখিক / লিখিত জবাব প্রদান করবে। **খ.** শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের কোনো পাঠ্যাংশ/ সমমানের বই পড়তে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করবেন। তারা পরস্পর প্রশ্ন করবে ও উত্তর দেবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। **গ.** শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে কয়েকটি শব্দ বোর্ডে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের এর অর্থ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ/বাক্য রচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থী মৌখিক বা লিখিতভাবে উত্তর দিবে।

শ্রেণিকক্ষে লেখা দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক সহজেই বুঝতে পারেন শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, ব্যাকরণগত ধারণা, বানান, শব্দভান্ডার ও অনুচ্ছেদ গঠনের ক্ষমতা কতটা সমৃদ্ধ। লেখা দক্ষতার নিয়মিত মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের ভুল ধরতে এবং তা সংশোধন করতে সাহায্য করে। অনেক শিক্ষার্থী সঠিক বানান, বাক্যগঠন, বিরামচিহ্ন বা ভাবের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। শিক্ষক যখন এসব দিক বিবেচনা রেখে মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন করেন, তখন শিক্ষার্থীরা তাদের দুর্বল জায়গা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং দৃর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আগ্রহী হয়। এতে শিক্ষার্থীরা মানসম্মত সৃষ্টিশীল মৌলিক লেখা লিখতে প্রয়াস পায়, শিক্ষার্থীর চিন্তা–শক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতা বিকাশেও সাহায্য করে। কারণ লেখার সময় শিক্ষার্থীকে ভাবতে হয় হয়-যা তাদের মানসিক চিন্তন দক্ষতা বিকাশে অবদান রাখে।

লেখা দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. এনকোডিং **খ.** স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লেখা **গ.** শব্দকোষ/ শব্দ ভাণ্ডার (শুদ্ধ বানান, সঠিক শব্দ) **ঘ.**ব্যাকরণ/ভাষিক কাজ **ঙ.** প্রাসঙ্গিকতা **চ.** ধারাবাহিকতা (ক - ঘ পর্যন্ত সব শেণির জন্য প্রযোজ্য। ঙ ও চ ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।)	**ক.** শিক্ষার্থী পৃথক পৃথক ধ্বনি ব্যবহার করে শব্দ তৈরি করতে পারছে কি না। যে বিষয়ে লিখবে/ লিখতে দেওয়া হবে সে বিষয় লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে কি না। **খ.** বর্ণ ও সংখ্যা পড়ে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারছে কি না। **গ.** শিক্ষার্থীরা লেখাতে বিষয়-সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে পারছে কি না। **ঘ.** কর্তা, ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং ব্যাকরণ ঠিক রেখে বাক্য লিখতে পারছে কি না। **ঙ.** শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে তা প্রাসঙ্গিকভাবে লিখতে পারছে কি না। **চ.** শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে তা ধারাবাহিকভাবে লিখতে পারছে কি না।	লিখিত মৌখিক ও পর্যবেক্ষণ	**ক.** মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট: নির্ধারিত বিষয় যেমন, আমার মা। **খ.** পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: শব্দ তালিকা যেমন, আম, ঈগল, উট **গ.** প্রশ্নপত্র, চিত্র: পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত পাঠ্যাংশ বা চিত্র	**ক.** শিক্ষাথীকে তার চারপাশের পরিবেশ হতে নির্ধারিত বিষয় বলে বা বোর্ডে লিখে দিয়ে সে সম্পর্কে কিছু লিখতে দিয়ে মূল্যায়ন করবেন। **খ.** শিক্ষক বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন, শিক্ষার্থী তা লিখবে এবং শিক্ষক সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন। **খ-১:** শিক্ষক ছবি প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থী তার ওপর কয়েক লাইন লিখবে। **খ-২:** একই/ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করে প্রত্যেককে কিছু লিখতে বলবেন। একদল অপর দলের মূল্যায়ন করবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন। **গ.** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো একটি পাঠ্যাংশ/চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে তার উপরে কিছু লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা যাচাই করবেন।

অধ্যায় ৯

ভাষা দক্ষতা: পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। একটি টেকসই রাষ্ট্রের বিনির্মাণে মাতৃভাষাভিত্তিক উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভাষা যোগাযোগের জন্য একটি শক্তিশালী বাহন। বিশ্বের অগণিত ভাষার মধ্যে, মাতৃভাষা ব্যক্তি ও সমষ্টিগত পরিচয়ে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। মাতৃভাষা একজন ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে জড়িত। ভাষা কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, লোককাহিনি এবং সামাজিক-পারিবারিক মূল্যবোধকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রেরণের একটি শক্তিশালী বাহক।

শিক্ষায় মাতৃভাষার উপর জোর দেয়ার একটি প্রাথমিক কারণ হলো সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় এর ভূমিকা। ভাষা সংস্কৃতির বাহকএবং মাতৃভাষা একটি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে ধারণ করে। যখন শিক্ষা মাতৃভাষায় পরিচালিত হয়, তখন সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক ভিত্তিগুলো নির্বিঘ্নে শেখার প্রক্রিয়ার সাথে জোরালোভাবে একত্রিত হয়। গুণগত শিক্ষা কার্যকর যোগাযোগ এবং বোঝার উপর নির্ভর করে। মাতৃভাষায় শিক্ষণ- শিখন প্রক্রিয়াশিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রে সহজ ও অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। শিক্ষক- শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ্যতা বজায় থাকে। বিষয়বস্তু এবং নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য মাতৃভাষার প্রয়োগের বিকল্প নেই। মাতৃভাষায় শিক্ষা জ্ঞানীয় বিকাশ এবং সমালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা বাড়ায়।

শিক্ষার্থীদের যখন তাদের নিজস্ব ভাষায় পড়ানো হয়, তখন শিক্ষার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণ, প্রশ্ন এবং মূল্যায়ন করতে সহজ হয়। মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নৈতিক দ্বিধা, মূল্যবোধ এবং নীতিগুলো আরও গভীরতা এবং স্পষ্টতার সাথে অন্বেষণ করতে পারে। একজনের নিজস্ব ভাষার সাথে মানসিক সংযোগ নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। তাছাড়া শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহার অন্তর্ভুক্তি এবং সহজলভ্যতাকে উৎসাহিত করে। তাই মানসম্মত ও নৈতিক শিক্ষার বিকাশে মাতৃভাষার গুরুত্বকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটি সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ, জ্ঞানীয় বিকাশ, মানসিক সংযোগ এবং অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি অন্যতম বাহক হিসাবে কাজ করে।

শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিক্ষাদানের লক্ষ্য হলো শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশ তথা মনের সব প্রকোষ্ঠের সম্মিলিত উন্নতি, যার বিভিন্ন নাম হতে পারে, যেমন চিন্তাশক্তির বিকাশ বা চিন্তাশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি, অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি, মননের বিকাশ ইত্যাদি। এ বিষয়ে যাঁরা মৌলিক গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও ইমানুয়েল কান্ট অন্যতম। জ্ঞানীয় বিকাশবিষয়ে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অন্যতম উপাদান হলো ভাষা এবং ভাষা বলতে এখানে মা, শিশুর সঙ্গে যে মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করেন। মা যদি শিশুর সঙ্গে তাঁর নিজের ভাষা বাদ দিয়ে, অন্য ভাষায় ভাবের আদান-প্রদানের চেষ্টা করেন, তাহলে শিশুর জ্ঞানগত বৈকল্য দেখা দিতে পারে অর্থাৎ এতে শিশুর মনের সম্মিলিত উন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে। মা শিশুর সঙ্গে যে ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করেন, শিশু সে ভাষায়ই চিন্তা করে; অতএব, বিদ্যালয়েও শিক্ষাদানের মাধ্যম সেই ভাষায় হতে হবে। এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। যদি কোনো কারণে মায়ের ভাষায় শিক্ষা দান করা না যায়, বিদ্যালয়ের যে উদ্দেশ্য, তা পুরোপুরি সফল হবে না কারণ বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান দান করা।

ইউনেস্কো মনে করে, শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার শিক্ষার গুণগত মানের জন্য অপরিহার্য। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সদস্যদেশগুলোর জন্য যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে, বহু ভাষা শিক্ষার কথা ঘোষণা করে; কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সদস্যদেশের, এমনকি এক দেশের ভেতরেও আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি তারা অনুসরণ করে। ওই দুই ক্ষেত্রেই মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে ও স্বাধীন ভারতে ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন ও পরবর্তী সময়ে (১৯৬৪-৬৬) কোঠারি কমিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অঞ্চল ভিত্তিতে যার যার মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রস্তাব করে।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এটি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত একটি ভাষা। এই স্বীকৃতি আমরা পাই ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ঘোষণার মাধ্যমে। দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে বাংলা চালু আছে। শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য তাই মূলত মাতৃভাষাকেই আশ্রয় করতে হয়। তবে মুখে কথা বলা আর কাগজপত্রে লেখা দুটোই শিখতে হয়, নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা রপ্ত করতে হয়। শুনে শুনে অভ্যস্ত হওয়া, বলে মনের ভাব প্রকাশ করা, পড়তে শেখা এবং কোন কিছু লিখে মনের ভাব প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জন করা তাই একান্ত প্রয়োজন। এই অনুশীলন ছাড়া ভাষা দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

ভাষা দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতি ও কৌশল (Language teaching learning method and strategy)

শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া হিসেবে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলভাবে পড়া, সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে লেখা, শব্দসম্ভার সমৃদ্ধ করা, বাক্যগঠনে দক্ষ হওয়া এ সবই ভাষা দক্ষতায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। শিক্ষাক্রমভিত্তিক ভাষা দক্ষতা শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে এবং জীবন ও পরিবেশ উপলব্ধিতে সহায়ক হয়।

এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় শেখার মাধ্যমও বাংলা। তাই বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন তার ভবিষ্যৎ জীবনে ব্যবহারিক ও কারিগরি বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের অনুকূল ভিত্তি প্রস্তুত করে দেয়। একই সঙ্গে ভাষিক দক্ষতা শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনে এবং স্বদেশ ও বিশ্ব, সমাজ ও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। ভাষা আয়ত্ত করার পদ্ধতি অর্থাৎ ভাষা দক্ষতা চারটি- শোনা, বলা, পড়া, লেখা। আর ভাষা হলো যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। তাই সঠিকভাবে যোগাযোগের জন্য মাতৃভাষা শেখাটা জরুরি। গবেষণায় দেখা গেছে- মাতৃভাষায় শেখা শিশুরা পাঠ্যক্রমের আরও ভালো বোঝার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। শিশু যখন দ্বিতীয় ভাষায় স্থানান্তরিত হয় তখন মাতৃভাষায় শেখানো দক্ষতাগুলো পুনরায় শেখানোর প্রয়োজন পড়ে না।

আমাদের মাতৃভাষা যেহেতু বাংলা, তাই জন্মের পর থেকেই একটি শিশু চারপাশে বাংলা ভাষায় কথা শুনতে পারে, একটু বড় হয়ে এই ভাষায় বলতে পারে, পড়ালেখা করার সুবাদে বাংলা পড়তে ও লিখতে পারে। কিন্তু বিদেশি ভাষা রপ্ত করার ক্ষেত্র ভিন্ন। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা শেখা ও বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি শেখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর এ কারণে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বাংলা ও ইংরেজি দুটি আলাদা বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমে স্থান করে নিয়েছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন করানো। শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী শিক্ষার ৩০টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাঝে একটি হল- বাংলা ভাষা শুদ্ধ ও ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা। আর এই কাজটি করার জন্য বিষয় হিসেবে প্রাথমিক স্তর থেকেই বাংলা পড়ানো হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রসঙ্গ কথায়ও দেখা যায়, বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি রচনার উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে— বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষাও বাংলা। ফলে বাংলা ভাষা শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে ।

আমাদের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই ভাষার চারটি দক্ষতাকে অর্জন করানোর জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যবই বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি পাঠের শুরুতেই দেওয়া আছে পাঠে কী করতে হবে, এর ফলে কোন দক্ষতাটা অর্জন হবে অর্থাৎ শিক্ষকের জন্য একটি নির্দেশনা দেওয়া থাকে পাঠটি কীভাবে পড়াতে হবে। কোন পাঠে শোনা- বলার দক্ষতা চর্চা করানো হবে, আরকোন পাঠে পড়া- লেখার দক্ষতা চর্চা করানো হবে তাও নির্ধারণ করা আছে।

একজন শিক্ষক যদি নির্দেশনাটি যথাযথ অনুসরণ করেন, তাহলে একজন শিক্ষার্থী ভাষার চারটি দক্ষতাই সমানভাবে অর্জন করতে পারবে।

প্রতিটি শিক্ষাস্তরের মাঝে ও শেষে একজন শিক্ষার্থীর ওই স্তরের শিক্ষা কতটুকু অর্জন করা হলো, তা যাচাই ও ফলাবর্তন প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তবে প্রাথমিক স্তরে সাধারণত সাময়িক পরীক্ষা ও বার্ষিক পরীক্ষাকেই গুরুত্বসহকারে দেখা হয়ে থাকে। এছাড়াও আছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। সব পরীক্ষাতেই বাংলা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকে অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী বাংলা বিষয়ের পাঠ্যবইটি আয়ত্তের মাধ্যমে কতটুকু প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারল তা মূল্যায়ন করা হয়।

যদিও ভাষার দক্ষতা চারটি কিন্তু প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র একটি ভাষাদক্ষতা অর্থাৎ লেখার দক্ষতাই পরিমাপ করা হয়। ব্যতিক্রম শুধু প্রথম শ্রেণির মূল্যায়ন। এখানে লেখার দক্ষতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর বলার দক্ষতাও পরিমাপ করা হয়। কিন্তু অন্য শ্রেণিতে শুধু পরীক্ষার খাতায় লেখার দক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষা বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ের প্রথম বর্ষে সকল শিক্ষার্থীকে বাংলা ভাষা বিষয়টি পাঠ করতে হয় ও এই কোর্সের শেষে একটি ব্যবহারিক পরীক্ষাও দিতে হয় যেখানে শোনা, বলা ও পড়ার দক্ষতা কতটা অর্জিত হয়েছে তা মূল্যায়ন করা হয়। এজন্য যা করানো হয় তা হলো-

১। শোনার জন্য: সবাইকে একটি সাউন্ডপ্রুফ রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে একটি প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের একটি অডিও শোনানো হয় আর এই অডিও শুনে তার থেকে উত্তর খুঁজে লিখতে হয়।

২। বলা ও পড়ার জন্য: শিক্ষক একজন করে শিক্ষার্থীকে রুমে নিয়ে যান, সেখানে একটি অডিও রেকর্ডারের সামনে কোনো বই থেকে পাঠ করতে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীকে সেই অংশটুকু জোরে জোরে পড়তে হয়। শিক্ষক পরবর্তীতে অডিও চালিয়ে দেখতে পারেন উচ্চারণসহ অন্যান্য বিষয় শিক্ষার্থী বলতে পারছে কিনা ও নির্ধারিত অংশটুকু যথানিয়মে পাঠ করতে পারছে কিনা।

প্রাথমিক স্তরেও এরকম ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চারটি ভাষা দক্ষতা মূল্যায়ন করা সম্ভব। যদি প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষার সাথে সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা যায় তবে ভাষাদক্ষতার কতটা অর্জিত হল তা মূল্যায়ন করা যায়। যেমন-

১। শোনার জন্য: শিক্ষক সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলবেন আর শিক্ষার্থীরা একে একে তার উত্তর দিবে। এভাবে শিক্ষক সহজেই শোনার দক্ষতার মূল্যায়ন করতে পারবেন অথবা শ্রুতলিপির মাধ্যমে লেখার দক্ষতার পাশাপাশি শোনার দক্ষতাও পরিমাপ করা যায়।

২। বলার জন্য: শিক্ষক একে একে সবাইকে দিয়ে কিছু না কিছু বলাবেন, হতে পারে এটা কোন কবিতা বা গল্প। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বলার দক্ষতার পরিমাপ করা যায়।

৩। পড়ার জন্য: শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের নির্বাচিত অংশ পড়তে দিয়ে পড়ার দক্ষতার পরিমাপ করা যায়।

এসব কাজের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী ভাষার চারটি দক্ষতার কোনটি কতটুকু অর্জন করতে পারল, তা সহজেই পরিমাপ করা যাবে। এর মধ্যদিয়ে একজন শিক্ষার্থী ভাষা ব্যবহারে স্বয়ংসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে। অর্জিত হবে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য।

ভাষা শেখা একটি প্রক্রিয়াধর্মী ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা; যেখানে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা- এই চারটি মৌলিক দক্ষতা ধাপে ধাপে বিকশিত হয়। কার্যকর ভাষা শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods), কৌশল (Techniques) ও শ্রেণিকক্ষ অনুশীলন (Activities) পরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করা জরুরি। এরকম কিছু ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি, কৌশল ও অনুশীলন পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(১) বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি (Alphabetical/ Letter-based Approach)

বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষার সূচনা হয় বর্ণ দিয়ে। শিশুকে প্রথমে বর্ণচিহ্ন, উচ্চারণ, আকৃতি, ক্রম, তথা বর্ণের মৌলিক ধারণা শেখানো হয়। এরপর ধীরে ধীরে শব্দ, বাক্য ও অনুচ্ছেদের দিকে অগ্রসর করা হয়।

মূল বৈশিষ্ট্য

- ধ্বনি বোঝা → বর্ণ চেনা → শব্দ গঠন → বাক্য গঠন- এই ক্রমানুসারে শেখানো হয়।
- বর্ণের আকৃতি, উচ্চারণ, গঠন, ব্যবহার শেখানো হয়।
- ধ্বনি-বর্ণ সম্পর্ক (letter- sound mapping) প্রতিষ্ঠায় জোর দেওয়া হয়।
- লেখার ভিত্তি মজবুত হয়, কারণ শিশু প্রথমেই বর্ণ শেখে।

শিক্ষণ কৌশল

- বর্ণমালার চার্ট, ফ্ল্যাশকার্ড, পোস্টার ব্যবহার
- বর্ণনুসারে শব্দ তালিকা তৈরি
- ধ্বনি- বর্ণ মিলিয়ে বলা (Phoneme- Grapheme Mapping)
- বর্ণ লেখা, আঙুল দিয়ে ট্রেসিং
- বর্ণ দিয়ে খেলা (লেটার গেম, ম্যাচিং, সিকোয়েন্সিং)

সুবিধা

- লেখাভিত্তিক দক্ষতা দ্রুত উন্নত হয়।
- বর্ণ ও শব্দের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে বোঝে।
- সঠিক উচ্চারণ গঠনে সহায়তা করে।

সীমাবদ্ধতা

- শুধু বর্ণ শেখা শিশুদের কাছে একঘেয়ে হতে পারে।

- অর্থবোধক ভাষা ব্যবহারের সুযোগ কম থাকে।
- যোগাযোগভিত্তিক দক্ষতা তুলনামূলক কম বিকশিত হয়।

(২) বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি (Sentence Pattern-Based / Structural Method)

এটি ভাষার কাঠামো-নির্ভর পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের ভাষার মৌলিক বাক্যরীতি (sentence patterns) শেখানো হয়। বাক্য কাঠামোর পুনরাবৃত্ত অনুশীলনের মাধ্যমে ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা গড়ে ওঠে।

মূল বৈশিষ্ট্য

- সাধারণ থেকে জটিল বাক্য রীতির অনুশীলন
- ব্যাকরণ, বাক্যগঠন ও শব্দচয়নের সঠিক রূপ চর্চা
- drill, substitution, transformation- এসব অনুশীলন ব্যবহারের মাধ্যমে সাবলীল পরিবর্তন শেখা
- যোগাযোগের আগে কাঠামো শেখানো- Form before Meaning

শিক্ষণ কৌশল

- Sentence Drill: একই বাক্যের বিভিন্ন রূপ বারবার অনুশীলন
- Substitution Table: একটি বাক্যে বিভিন্ন শব্দ বসিয়ে নতুন বাক্য গঠন
- Transformation: ধনাত্মক → ঋনাত্মক, প্রশ্নবোধক → বিবৃতি রূপে রূপান্তর
- Guided Speaking: নির্দিষ্ট বাক্যরীতির ভিত্তিতে কথা বলা

সুবিধা

- ব্যাকরণিক সঠিকতা বৃদ্ধি পায়।
- ভাষার কাঠামো বুঝতে সক্ষম হয়।
- বাক্য গঠনে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

সীমাবদ্ধতা

- বাস্তব যোগাযোগের পরিস্থিতি কম তৈরি হয়।
- মুখস্থভিত্তিক হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- সৃজনশীলতা এবং ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার কম দেখা যায়।

(৩) সামগ্রিক ভাষা শিখন পদ্ধতি (Whole Language Approach / Integrated Language Learning)

সামগ্রিক ভাষা শিখন পদ্ধতিতে ভাষা শেখা হয় অর্থপূর্ণ, বাস্তব এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। এখানে বর্ণ, শব্দ ও বাক্য আলাদা করে নয়- বরং ভাষাকে একটি সমন্বিত সিস্টেম হিসেবে শেখানো হয়।

মূল বৈশিষ্ট্য

- ভাষার চারটি দক্ষতা- শোনা, বলা, পড়া, লেখা সমন্বিতভাবে শেখানো হয়।

- বাস্তব পাঠ্য (authentic text) ব্যবহার করা হয়- গল্প, কবিতা, অভিজ্ঞতা, আলোচনা ইত্যাদি।
- শিক্ষা হয় অর্থপূর্ণ যোগাযোগ, অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে (meaningful context)
- শিশু নিজের ভাষা প্রয়োগ করে শেখে- Learning by Using Language
- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা।

শিক্ষণ কৌশল

- গল্প শোনা- বলা (Storytelling & Retelling)
- থিম বা বিষয়ভিত্তিক পাঠ (Theme-Based Learning)
- রিডিং- রাইটিং ওয়ার্কশপ
- চিত্রভিত্তিক আলোচনা
- প্রকল্পভিত্তিক ভাষা কার্যক্রম
- সমবেত পাঠ (Shared Reading), নির্দেশিত পাঠ (Guided Reading)

সুবিধা

- বাস্তব ভাষা ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়;
- শোনা, বলা, পড়া, লেখা- সব দক্ষতা একসঙ্গে উন্নত হয়;
- শিশুদের সৃজনশীলতা, চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ে;
- ভাষা শেখা আনন্দময় হয়।

সীমাবদ্ধতা

- শিক্ষকের দক্ষতা প্রয়োজন বেশি।
- উপকরণ প্রস্তুতির সময় লাগে।
- দুর্বল পাঠকদের অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন হয়।

পদ্ধতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

পদ্ধতি	ফোকাস	সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
বর্ণানুক্রমিক	বর্ণ ⟶ শব্দ ⟶ বাক্য	মৌলিক সাক্ষরতা, সঠিক উচ্চারণ	অর্থবোধক যোগাযোগ কম
বাক্যানুক্রমিক	বাক্য কাঠামো	ব্যাকরণিক দক্ষতা	মুখস্থ নির্ভরতা
সামগ্রিক ভাষা	অর্থপূর্ণ ভাষা ব্যবহার	সব দক্ষতা সমন্বিতভাবে উন্নয়ন	দক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা

শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষকের প্রথম কাজ হলো শেখার জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ তৈরি করা। শিক্ষণ- শিখন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য শিক্ষকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সাধারণ ভূমিকার পাশাপাশি শেখার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। প্রচলিতভাবে তিনটি পর্যায় বিবেচনা করা হয়:

১. আমি করি (I Do)- যে কোন নতুন বিষয় শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক সেই বিষয়টি প্রথমে নিজে মডেল উপস্থাপন করেন বা শিক্ষার্থীদেরকে নিজে করে দেখান।

২. আমরা করি (We Do)- এ পর্যায়ে শিক্ষক সেই নতুন বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে অনুশীলন করেন।

৩. তুমি কর (You Do)- শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে নতুন বিষয়টি নিজে নিজে অনুশীলন করে।

এই পুরো বিষয়টিকে বলা হয় Gradual Release of Responsibility- যা একটি বহুল ব্যবহৃত শিক্ষণ- শিখন মডেল, যেখানে শিক্ষক ধীরে ধীরে শেখানোর দায়িত্ব শিক্ষার্থীর কাছে হস্তান্তর করেন। এটিকে “I do → We do → You do” মডেলও বলা হয়। এই শিক্ষণ- শিখন প্রক্রিয়ায় শেখার দায়িত্ব ধীরে ধীরে শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীর হাতে যায়, এতেশিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বাড়ে এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয় শেখা (active learning) নিশ্চিত হয়। সেই সাথে শিক্ষকের ভূমিকা শিখন সহায়ক বা facilitator- এ রূপ নেয়। এর মাধ্যমে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিখনে যথার্থতা (Accuracy) ও সাবলীলতা (Fluency) নিশ্চিত হয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এ কারণে প্রাথমিক স্তরে চারটি মৌলিক ভাষিক দক্ষতার (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) সমন্বিত ও সুষ্ঠু প্রয়োগের সামর্থ্য অর্জন শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষা শেখার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করার সঙ্গে ঐ চারটি দক্ষতাও অর্জন করতে পারবে এমন প্রত্যাশাই স্বাভাবিক । অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যদি প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণির পড়াশোনা শেষ করতে পারে, তাহলে ভাষাজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার যেটুকু জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জিত হবে, তা দিয়ে সে সমাজ-পরিবেশে বাস্তব জীবনে বাংলাভাষা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

মাতৃভাষায় পাঠদান শিক্ষাবিজ্ঞানের মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবিকাশ, ভাষা দক্ষতা, সামাজিক সম্পৃক্ততা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের আলোকে বলা যায়- প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি কার্যকরভাবে নির্মাণ করতে হলে মাতৃভাষায় পাঠদানই সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও সার্থক পদ্ধতি।

অধ্যায় ১০

ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ

শিখন শিক্ষণে উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের নিকট সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিখনকে দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যেই সহায়ক সম্পূরক উপকরণ ব্যবহার করা হয়। সম্পূরক উপকরণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সাধারণত বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে শিক্ষক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কোন পাঠে কোন উপকরণ ব্যবহৃত হবে। তাই শিক্ষককে বিষয়ের ভিত্তিতে উপকরণ নির্বাচন, তৈরি ও সংগ্রহ, সঠিক সময়ে সেগুলোর সঠিক

ব্যবহার এবং সেগুলোর সংরক্ষণ বিষয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণ হতে হয়। উপকরণ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না হলে অথবা উপকরণ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে প্রদর্শিত না হলে শিক্ষণের ক্ষেত্রে তা ইতিবাচক প্রভাবের পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মন্তেসরি (Montessori) তার শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিশেষভাবে ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ (Sense- Training) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তার শিক্ষানীতির মূলবক্তব্য হলো, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে হবে। আধুনিককালে মনোবিদরাও তার এই শিক্ষনীতিকে সমর্থন করেন। তারা মনে করেন, বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। সুতরাং, জ্ঞানের বস্তুকে যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলা যায়, তবেই শিখন সম্ভব হবে।

একটি উদাহরণ উল্লেখকরা যাক। শিশু প্রথমে কমলা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সে যদি শুধু চোখে দেখে কমলা চিনতে শেখে, তাহলে ঐ বস্তু সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান হয়না। জিনিসটি হাতে স্পর্শ করার, গন্ধ নেওয়ার এবং স্বাদ বিচার করারও প্রয়োজন আছে। এইভাবে কমলাটিকে যদি চোখ, হাত, ত্বক, নাক, জিহবা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আনা যায় তবেই তার সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান পাওয়া যাবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই যুক্তি প্রযোজ্য। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু গ্রহণের জন্য একক ইন্দ্রিয়ানুভূতি যথেষ্ট নয়; একই সাথে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতে পারলে শিখন স্থায়ী হয়। মনোবিদ্যার এই নীতি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এই প্রভাবের ফলস্বরূপ শিক্ষণের ক্ষেত্রে সম্পূরকউপকরণের গুরুত্ব অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

সম্পূরক উপকরণ (Supplementary Materials)

সম্পূরক উপকরণ বা Supplementary Materialsবলতে মূল পাঠ্যপুস্তক বা প্রধান শিক্ষণ উপকরণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর শেখা গভীর, আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার জন্য ব্যবহৃত অতিরিক্ত শিক্ষণ সামগ্রীকে বোঝায়। এগুলো পাঠ্যবস্তুকে সমৃদ্ধ করে এবং শেখাকে বাস্তবমুখী করে তোলে।এটি মূলত পরিপূরক, সহায়ক বা অতিরিক্ত শিখন উপকরণ যা শিক্ষার্থীদের প্রধান পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। এগুলো মূল পাঠের বিকল্প নয়; বরং মূল বিষয়বস্তুকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। এই সহায়ক বা সম্পূরক উপকরণ –

- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করে;
- শিক্ষার্থীর বোঝাপড়া বাড়ায়;
- দক্ষতা চর্চার সুযোগ দেয়;
- শেখার আগ্রহ বাড়ায়;

এগুলো মুদ্রিত, ডিজিটাল বা বাস্তবীয় (hands-on) সব ধরনের হতে পারে।

সম্পূরক উপকরণের ধরন

১. মুদ্রিত উপকরণ বা Print Materials

- গল্প, কবিতা, উপন্যাস;
- পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের আর্টিকেল;
- ওয়ার্কশিট, অনুশীলনী খাতা;
- পোস্টার, বুকলেট;

- রিসার্চ পেপার, জার্নাল;

২. দৃশ্য উপকরণ বা Visual Materials

- ছবি, চার্ট, গ্রাফ;
- ইলাস্ট্রেশন, পোস্টার;
- ম্যাপ, ডায়াগ্রাম;
- ইনফোগ্রাফিক;

৩. অডিও-ভিজ্যুয়াল উপকরণ বা Audio-Visual Materials

- শিক্ষামূলক ভিডিও;
- ডকুমেন্টারি;
- অ্যানিমেশন;
- অডিও লেকচার, পডকাস্ট;

৪. ডিজিটাল উপকরণ বা Digital Materials

- শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট;
- ই-বুক, পিডিএফ;
- অনলাইন কুইজ বা ইন্টার্যাকটিভ কন্টেন্ট;
- লার্নিং অ্যাপস;

৫. অনুশীলনীভিত্তিক উপকরণ বাActivity-based Materials

- প্রজেক্টউপকরণ;
- লার্নিং গেম;
- ভূমিকাভিনয়;

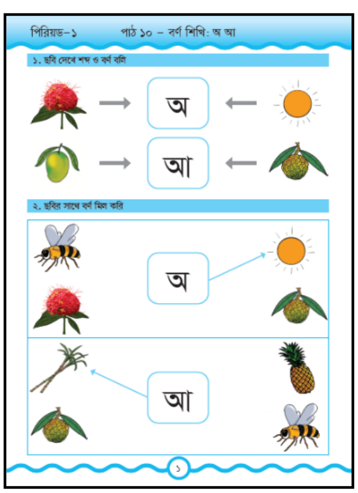

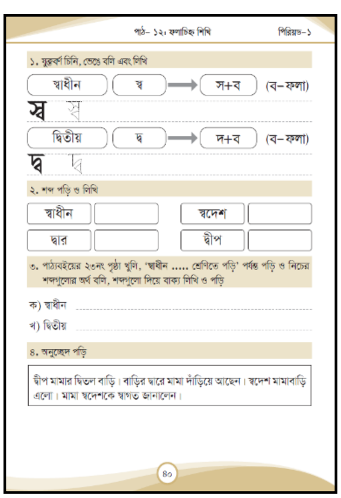

চিত্র: ভাষা শিখনে কিছু সম্পূরক উপকরণের চিত্র

সম্পূরক উপকরণশেখার কার্যকারিতা, গভীরতা ও আকর্ষণীয়তা বাড়াতে অত্যন্ত কার্যকর। চীন দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে, দশ হাজার শব্দ ব্যবহার করে যা বোঝানো যায় না,একটি মাত্র ভালো ছবির সাহায্যে তা বোঝানো যায়।

বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলার মাধ্যমে শিখন স্থায়ী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সম্পূরক উপকরণ ব্যবহার করা হয়। উপকরণ পাঠদানে বৈচিত্র্য আনে এবং শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমী দূর করে পাঠের প্রতি মনোযোগী করে। উপকরণবিহীন পাঠদান কার্যক্রম যান্ত্রিক ও একমুখী প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়। শিক্ষাকার্যক্রমকে সক্রিয় ও মূর্ত করার জন্য উপকরণ ব্যবহার অপরিহার্য।

আধুনিক পাঠদান পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে পাঠদানের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের নিকট গ্রহণযোগ্য, সহজ ও বাস্তবভিত্তিক করে উপস্থাপন করা। আর শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় রাখার জন্য এবং পাঠের জটিল বিষয়বস্তুকে সহজ করার জন্য সম্পূরক উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিতে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করলে বিষয়বস্তু সহজেই শিক্ষার্থীদের মনে ছাপ ফেলে এবং শিক্ষার্থীরা তা মনে রাখতে পারে। শিক্ষাবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির আলোকে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার মূল কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো–

১. শেখাকে বহু-মাত্রিক ও আকর্ষণীয় করে তোলে

শুধু পাঠ্যপুস্তক নয়– ছবি, ভিডিও, মডেল, বাস্তব বস্তু, কুইজ- এসব ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা উৎসাহী হয়।

- শেখা একঘেয়ে থাকে না;
- মনোযোগ বাড়ে;

২. কঠিন ধারণা সহজ করে বোঝানো যায়

অনেক বিষয় কেবল কথা বা লেখায় বোঝানো কঠিন, যেমন: সৌরজগৎ, ভগ্নাংশ, শ্বসনপ্রক্রিয়া, ব্যাকরণ–

এসব Supplementary Materialsদিয়ে দৃশ্যমান/বাস্তব করা যায়।

- ধারণাগত বোঝাপড়া (Conceptual Understanding) শক্তিশালী হয়।

৩. ভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর প্রয়োজন পূরণ করে (Differentiated Learning)

প্রত্যেক শিক্ষার্থী একইভাবে শেখে না। কারও ভিজ্যুয়াল, কারও অডিটরি, কারও কিনেস্থেটিক, কারও রিডিং-রাইটিং প্রবণতা বেশি। Supplementary Materialsএসব ভিন্ন শেখার ধরনকে সমর্থন করে।

- Inclusive Classroomতৈরি হয়।

৪. **বাস্তব জীবনের সঙ্গে শেখাকে যুক্ত করে (Real-life Connection)**

বাস্তব বস্তু, মডেল, ছবি বা ভিডিও ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা শেখাকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারে।

- শেখা বেশি অর্থবহ হয়;
- শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৫. উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার (Higher Order Thinking Skills) বিকাশ করে

চার্ট, গ্রাফ, কেস-স্টাডি, গবেষণাভিত্তিক অ্যাক্টিভিটি শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ (analysis), তুলনা (comparison), যুক্তি (reasoning), সৃজনশীলতা (creativity) বাড়ায়। এতে ২১-শতকেরদক্ষতাগড়েওঠে।

৬. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটায়

ভিডিও আলোচনা, গ্রুপ টাস্ক, চার্ট ব্যবহার, গেম, মডেল- এসব শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে।

- সক্রিয় শিখন (Active Learning) নিশ্চিত হয়।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষ (Student-centered classroom) তৈরি হয়।

৭. মূল্যায়নকে সহজ ও কার্যকর করে

ওয়ার্কশিট, কুইজ, প্রজেক্ট টেমপ্লেট ইত্যাদি শিক্ষককে গাঠনিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

- শেখার অগ্রগতি তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যায়।
- উন্নয়নের ক্ষেত্র শনাক্ত করা যায়।

৮. শেখার বৈচিত্র্য ও গভীরতা বাড়ায়

একই বিষয় শেখাতে বিভিন্ন সম্পূরক উপকরণ ব্যবহার করলে–

- শেখা গভীর হয়
- পুনরাবৃত্তি সহজ হয়
- জ্ঞান বহুমুখীভাবে গড়ে ওঠে

ভাষা শিক্ষায় সম্পূরক উপকরণহলো এমন অতিরিক্ত ভাষাগত উপকরণ যা মূল পাঠ্যবইয়ের বাইরে ব্যবহার করা হয় ভাষা শেখাকে সহজ, আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার জন্য। এগুলো শোনা, বলা, পড়া ও লেখা—এই চারটি ভাষাগত দক্ষতা উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভাষা শিক্ষায় সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

- মূল পাঠ্যবই সীমিত উদাহরণ দেয়; সম্পূরক উপকরণ শিক্ষার্থীদের বেশি উদাহরণের সুযোগ (exposure) দেয়।
- গান, ভিডিও ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়বস্তুশোনে ও দেখে।
- শোনা, বলা, পড়া ও লেখা- সব ক্ষেত্রেই বাড়তি অনুশীলন হয়।
- গল্প, গেম বা ভিডিও শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতি অনুপ্রাণিত করে।

৫. ভিন্নধর্মী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী

সকল ধরনের শিখন চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করে। যেমন-

Visual learners→ছবি, চার্ট

Auditory learners→অডিও

Kinesthetic learners→গেম, অ্যাক্টিভিটি

ভাষা শিক্ষায় নমুনা সম্পূরক উপকরণ উন্নয়ন

ভাষা শিক্ষায় নমুনা সম্পূরক উপকরণ উন্নয়নের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা কার্যকরভাবে শিখতে পারে এবং উপকরণ তাদের বয়স ও ভাষা দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। নিচে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো–

১. শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী উপযুক্ততা

- শব্দভান্ডার ও বাক্যগঠনশিক্ষার্থীর বয়স ও মান অনুযায়ী সহজ হতে হবে।
- ছোটদের জন্য সরল বাক্য ও চিত্রভিত্তিক উপকরণ।
- বড়োদের জন্য জটিল বাক্য, সংক্ষিপ্ত গল্প, আর্টিকেল বা ডায়লগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. ভাষা দক্ষতার চারটি দিক (LSRW) সমন্বয়

- Listening (শ্রবণ)- অডিও ক্লিপ, গান, কবিতা আবৃত্তি।
- Speaking (কথন)- Role-play, discussion prompts, ছবি বর্ণনা।
- Reading (পঠন)- ছোট গল্প, আর্টিকেল, রিডিং প্যাসেজ।
- Writing (লিখন)- Sentence building, short paragraph, dictation।

উপকরণে চারটি ভাষা দক্ষতা চর্চার সুযোগ রাখা যেতে পারে।

৩. শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও বাস্তব জীবনের প্রাসঙ্গিকতা

- গল্প, ভিডিও, ছবি বা প্রকল্প বাস্তব জীবনের উদাহরণের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংযুক্ত করলে শিক্ষার্থীর শিখন সহজ হয়।

৪. ভিজ্যুয়াল ও মাল্টিমিডিয়া উপকরণের ব্যবহার

- চিত্র, ছবি, চার্ট বা পোস্টার শিক্ষার্থীদের বোঝাপড়া সহজ করে।
- অডিও-ভিজুয়াল উপকরণ শ্রবণ ও উচ্চারণে সাহায্য করে।
- Interactive games ও অনলাইন কুইজ শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখে।

৫. শব্দভান্ডার ও ব্যাকরণ

- নতুন শব্দ ও ব্যাকরণেরনিয়ম সহজ করে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- Flashcard, matching game, crossword, sentence formation ইত্যাদি কার্যক্রম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. শিক্ষার্থীর শেখার ভিন্নতা বিবেচনায়

- Visual learners -ছবি, ডায়াগ্রাম, infographic।
- Auditory learners - গান, অডিও ক্লিপ, কবিতা আবৃত্তি।
- Kinesthetic learners - role-play, project।

৭. মূল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়া

- উপকরণে ছোট প্রশ্ন, অনুশীলন ও স্ব-মূল্যায়ন কার্যক্রম রাখা।
- শিক্ষার্থীর শেখার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।

নমুনা সম্পূরক উপকরণ তৈরি করতে হলে শ্রেণি ও বয়স উপযোগিতা, চারটি ভাষা দক্ষতার সমন্বয়, বাস্তব জীবনের প্রাসঙ্গিকতা, ভিজ্যুয়াল ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার, শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণ, শিক্ষার্থীর ভিন্ন শেখার ধরন, কার্যক্রমভিত্তিক শিখন ও মূল্যায়ন সবই বিবেচনা করতে হবে।

ভাষা শিখনেসম্পূরক উপকরণের ব্যবহারকৌশল

ভাষা শিখনেসম্পূরক উপকরণের ব্যবহারকৌশল জানা শিক্ষকের জন্য খুবই জরুরি, যেহেতু এর ব্যবহার মূল পাঠ্যবইয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সম্পূরক উপকরণের ব্যবহার শুধু শিখনকে আকর্ষণীয় করে না, বরং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণও নিশ্চিত করে। নিচে বিস্তারিতভাবে কৌশল ও অনুশীলনের ধাপ দেওয়া হলো—

১. লক্ষ্য নির্ধারণ

প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন দক্ষতা (Listening, Speaking, Reading, Writing) বা ভাষার দিক (শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ, উচ্চারণ) উন্নয়নের জন্য সম্পূরক উপকরণ ব্যবহার করা হবে।

উদাহরণ:

- Listeningউন্নয়নের জন্য: অডিও গল্প, গান, কবিতা আবৃত্তি;
- Speakingউন্নয়নের জন্য: ভূমিকাভিনয়, ছবি বর্ণনা;
- Readingউন্নয়নের জন্য: ছোট গল্প, অনুচ্ছেদ;
- Writingউন্নয়নের জন্য: sentence formation, picture composition।

২. উপকরণ নির্বাচন

শ্রেণি ও শিক্ষার্থীর বয়স উপযোগী উপকরণ নির্বাচন করতে হবে।

প্রথম শ্রেণির জন্য উদাহরণ:

- ছবি, চার্ট, Flashcard;
- ছোট গল্প বা Nursery rhyme;
- অডিও ক্লিপ (ছোট সংলাপ);
- ওয়ার্কশিট বা ছবি দেখে লেখা।

৩. ধাপে ধাপে ব্যবহার কৌশল

পাঠ- পূর্ববর্তী (Pre-Activity)

- বিষয়ভিত্তিক ছবি, শব্দ বা প্রশ্ন দিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- নতুন শব্দ বা ব্যাকরণ পরিচয় করানো।

পাঠ চলাকালীন (During Activity)

- নির্বাচিত সম্পূরক উপাদান দিয়ে কার্যক্রম করানো।
- Reading, Listening, Speaking, Writingকার্যক্রমে ব্যবহার।

পাঠ পরবর্তী (Post-Activity)

- শেখা বিষয় পুনরায় আলোচনা বা অনুশীলন করা।
- শিক্ষার্থীদের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন (self-assessment) বা peer review) করানো।

৪. পুনরাবৃত্তি ও মূল্যায়ন

- শব্দভাণ্ডার ও বাক্য গঠন নিয়মিত অনুশীলন করা।
- শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা পর্যবেক্ষণ করা।
- ছোট কুইজ, ছবি বা অডিও ক্লিপ দিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করা।

ভাষা শিখনে সম্পূরক উপাদান ব্যবহার করতে হলে- লক্ষ্য নির্ধারণ, উপকরণ নির্বাচন, ধাপে ধাপে ব্যবহার এবং পুনরাবৃত্তি ও মূল্যায়ন- এই কৌশলগুলো অনুসরণ করতে হবে।

ভাষা শিখনে কতিপয় সম্পূরক কাজের উদাহরণ

১। বর্ণ ও কারচিহ্ন যোগে শব্দ তৈরি করা

পরিপ্রেক্ষিত: শিক্ষার্থীদের সকল স্বরবর্ণ ও ক থেকে ঙ পর্যন্ত বর্ণ ও আ-কার, ই-কার, ঈ-কার শেখানো হয়েছে। বর্ণ ও কারচিহ্ন সহযোগে শব্দ তৈরির কাজ (বলা ও লেখা) করতে দিন।

উদাহরণ: অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ া ি

	ক	খ	গ	ঘ
ঠ	কা	খা	গা	ঘা
ড	কি	খি	গি	ঘি
ঢ	কী	খী	গী	ঘী

২। এলোমেলোভাবে সাজানো বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করা

হ ং শি-

র দে শে-

র বে ভো লা-

ৎ কা র শ ল-

মা আ শ র দে দে -

৩। নির্দিষ্ট বর্ণ ও কারচিহ্ন ব্যবহারে বাক্য তৈরি করে লেখা ও পড়া

পরিপ্রেক্ষিত: শিখন শেখানো কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সকল স্বরবর্ণ এবং ক থেকে ঞ পর্যন্ত বর্ণগুলো শিক্ষার্থীরা শনাক্ত করতে পারে এবং লিখতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষক আ (া) কার-চিহ্ন চিনেছে এবং বর্ণের সঙ্গে আ (া) কার-চিহ্নযুক্ত করে শিক্ষার্থীদের পড়তে পারার চর্চা করিয়েছেন। বর্ণিত শর্ত মেনে একটি পঠন উপকরণ তৈরি করুন।

উদাহরণ: কাক কই? ওই কাক। চা চাই। খই খাই।

৪। নির্দিষ্ট যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন শব্দ লেখা ও পড়া

পরিপ্রেক্ষিত: প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে সাত দিনের কথা গল্পে নিচের পাঠটি পড়ানো হয়েছে।

সাত দিনে এক **সপ্তাহ**। দিনগুলোর সাতটি নাম। **ট্রেনের** সামনে বসে আছে অভি। অভির কাছে দিনগুলোর নাম শুনি। সাত দিনে কত কাজ করি আমরা। কখনও পড়ি, কখনও খেলি। কোনো দিন একেবারে ছুটি। ছুটির দিনে আরাম করি। অভি

শনিবার বাগানে পানি দেয়। রবিবার গান শোনে। সোমবার ছবি আঁকে। **মঙ্গলবার** সাইকেল চালায়। বুধবার মাঠে খেলতে যায়। **বৃহস্পতিবার** ছড়ার বই পড়ে। **শুক্রবার** কাগজ কেটে ফুল বানায়। অভি ছুটির দিনে টেলিভিশন দেখে।

পাঠটিতে যে সকল যুক্তব্যঞ্জন (প্ত ট্র ক্র ঙ্গ স্প) ব্যবহার করা হয়েছে উক্ত যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত নতুন শব্দ ব্যবহার করে একটি সমমানের গল্প তৈরি করি।

৫। শব্দসিঁড়ি

খেলার পরিকল্পনা-

- শিক্ষার্থীর শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধির জন্য পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে খেলাটি শুরু করুন;
- যেকোনো একজন শিক্ষার্থীকে একটি শব্দ বলতে বলুন;
- শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে অন্য একজন শিক্ষার্থীকে একটি শব্দ বলতে বলুন;
- শব্দ বলার আগে সতর্ক থাকতে বলুন, যেন পূর্বের শব্দের শেষ বর্ণটি পুনরায় নতুন শব্দের শেষ বর্ণ না হয়;
- এমনটি হলে খেলা শেষ হয়ে যাবে তা বলে দিন;
- সকলের অংশগ্রহণে খেলাটি চলমান রাখতে চেষ্টা করুন।

বা	তা	স				
		বু				
		জ	ল			
			তা	লা		
				উ	র্ব	র
						স

৬। বাক্য তৈরি

খেলার পরিকল্পনা-

- একটি শব্দ দিয়ে একাধিক বাক্য তৈরি করতে দিন;
- অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে দিন;
- বাম পাশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে বাক্য তৈরি করতে দিন;
- এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে বাক্য লিখতে ও পড়তে দিন|

৭। শব্দজাল

খেলার পরিকল্পনা-

- বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে বর্ণিত ছকের মতো কোনো ফুল/ফল/পাখির নাম বৃত্তের মাঝখানে লিখুন

- নিজ নিজ খাতায় প্রদর্শিত ছকটি এঁকে বৃত্তের চারপাশে শিক্ষার্থীর জানা ফুল/ফল/পাখির নাম লিখতে বলুন

(বি. দ্র. বৃত্তের চারপাশে ফুল/ফল/পাখির ছবি দিয়েও শিক্ষার্থীদের নাম লিখতে সহায়তা করা যায়)

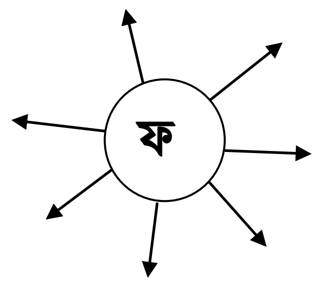

৮। ধারাবাহিকভাবে গল্প বলা

- পরিপ্রেক্ষিত: ৩য় শ্রেণিতে হারজিতের গল্প পড়ানো শেষে শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিক্ষক একটি নতুন গল্পের অবতারণা করতে চেয়েছেন।

৯। ছবি দেখে বলা ও লেখা

ছবি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

১০। বাক্য সাজিয়ে গল্প লেখা

পরিপ্রেক্ষিত: গল্পের বাক্যগুলো এলোমেলো করে লেখা রয়েছে। বাক্যগুলো সাজিয়ে গল্পটি লিখতে হবে।

ওরা দুইজনেই গ্রামের স্কুলে পড়ে। বৈশাখি মেলা। ওই গ্রামেই আরিফের বাড়ি। ওদের বাবা-মা সঙ্গেই যাবেন। গ্রামের নাম হাশিমপুর। আরিফের ছোট বোনের নাম রেবেকা। পাশের গ্রামেই মেলা বসেছে। ওরা আজ মেলায় যাবে।

সম্পূরক পঠন সামগ্রী

আমরা সাধারণত শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক পঠন সামগ্রী পড়ার মাধ্যমে অধিক উপকৃত হতে পারে। কল্পকাহিনি বা বাস্তবধর্মী উভয় ধরনের পঠন সামগ্রী দিয়েই শুরু হতে পারে শিশুর পড়ার যাত্রা। উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক পাঠ সামগ্রীর ধরন নিচে দেওয়া হলো। যেমন-

কাল্পনিক গল্প বা উপন্যাস, পৌরাণিক কাহিনি, উপকথা, লোককাহিনি, রূপকথা, কবিতা, নাটক (অভিনয় করা যায় এমন পান্ডুলিপি) ইত্যাদি।

আবার বাস্তবধর্মী গল্প/প্রবন্ধ বা তথ্যমূলক লেখা, সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, পত্রিকার লেখা, তথ্যভিত্তিক বই, সাধারণ জ্ঞান, জীবনকাহিনি, মনীষীর জীবনী, বক্তৃতা, কবিতা ইত্যাদিও শিশুদের পাঠ অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

নিয়মিত পাঠ অভ্যাস হলো কার্যকর শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার একটি মৌলিক উপাদান। নিয়মিত পড়া চর্চা ও বার বার বিভিন্ন ধরনের পড়ার মাধ্যমে শিশুরা পড়ার অভিজ্ঞতা অর্জনে লাভবান হয়।

শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী করে তোলা ও পাঠ গ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্দীপনা ও প্রেষণা সৃষ্টি করার জন্য সম্পূরক উপকরণ ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করা ও বিভিন্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে সমানভাবে পাঠে সম্পৃক্ত করার জন্য শিখন-শিক্ষণে সম্পূরক উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

অধ্যায় ১১

বাংলা পাঠপরিকল্পনা

পাঠ্যপুস্তকে পাঠের বিষয়গুলো একটি পুরো শিক্ষাবর্ষের জন্য বিন্যস্ত। সমগ্র শিক্ষাবর্ষের জন্যে এটি প্রণীত হয় বলে একে বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা বলা হয়। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করে নিলে নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠের বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলভাবে পাঠদান করা যায়।

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর কাজ ও মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক যেসব কলাকৌশল অবলম্বন করেন তার লিখিত বিবরণ হলো পাঠ-পরিকল্পনা। শ্রেণিতে পঠন-পাঠনের কাজ শুরু করার আগে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। একটি কার্যকর পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে পাঠের উদ্দেশ্য, শিক্ষক কিভাবে পাঠ শুরু করবেন, শিক্ষার্থীর চাহিদা বিবেচনা করে কী কী উপকরণ ব্যবহার করবেন, কী কী প্রশ্ন করবেন, সময় নির্ধারণ, শিখন-শেখানো পদ্ধতিগুলোর বিস্তারিত বিবরণ,কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ইত্যাদি বিষয়ে তাকে সুচিন্তিত কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

পাঠপরিকল্পনার গুরুত্ব

শিক্ষা প্রক্রিয়ার দুটি দিক হচ্ছে শিখন-শেখানো। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন-শেখানোর কাজ চলে প্রধানত শ্রেণিকক্ষে। শিক্ষার্থীর শিখনে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন শিক্ষক। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান ও মতবিনিময়ের মধ্য দিয়েই শিখন-শেখানোর কাজ সার্থক ও কার্যকর হয়ে ওঠে। এই দায়িত্ব পালনে শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের অন্যতম আবশ্যকীয় কাজ হলো পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন।

১। পাঠপরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য জানা যায়;
২। পাঠের বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়;
৩। উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায়;
৪। সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও মনোবিজ্ঞান সম্মত ভাবে পাঠ উপস্থাপন করা যায়;
৫। সময় অপচয় রোধ করা যায়;
৬। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়;
৭। মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়;
৮। শিক্ষার্থীর জ্ঞান ওদক্ষতা যাচাই করা যায়;
৯। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়;
১০। অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা যায়;
১১। পাঠদান প্রক্রিয়া আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ হয়;
১২। যথাসময়ে সিলেবাস শেষ করার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

পাঠপরিকল্পনার প্রবক্তা

পাঠপরিকল্পনা (Lesson Plan) নিয়ে সর্বপ্রথম কথা বলেন হার্বার্ট স্পেনসার। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাঠ পরিকল্পনা একজন শিক্ষকের পাঠদানের দক্ষতা ও কৌশলজ্ঞান অনেকাংশে বাড়িয়ে দিতে পারে। ফ্রেডরিক হার্বার্ট পাঠদানের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করার কথা বলেন যা বাঙালি শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের কাছে পাঠপরিকল্পনার পঞ্চসোপান বা হার্বার্টের পঞ্চসোপান নামে পরিচিত। হার্বার্টের পঞ্চসোপান ইংরেজিতে 'Herbert's Five Steps of Lesson Plan' নামে পরিচিত। ব্রিটানিকার তুলে ধরা তথ্য অনুসারে হার্বার্টের পঞ্চসোপানে যা আছে তা হলো-

১. প্রস্তুতি (Preparation)

নতুন কোনো কিছু শিক্ষাদানের আগে ওই বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়েছে এমন অথবা শিক্ষার্থীরা জানে এমন কোনো কিছুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের নাম হলো প্রস্তুতি। প্রস্তুতি পর্বের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের প্রতি আগ্রহী করার প্রচেষ্টা করা হয়।

২. উপস্থাপন (Presentation)

প্রস্তুতিপর্ব সাফল্যের সাথে শেষ করার পর পাঠের বিষয়বস্তু প্রকৃত অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা করতে হয়। উপস্থাপন যদি প্রকৃত অভিজ্ঞতার আলোকে না হয় তাহলে শিখন কার্যকর হয় না।

৩. সংযোগ (Association)

হার্বার্টের শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সংযোগ হলো শিক্ষার্থীদের পূর্বধারণার সাথে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপিত পাঠের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে তুলনাকরণের মাধ্যমে মিল এবং অমিল বা পার্থক্যগুলো বিবেচনার মাধ্যমে নতুন ধারণার সৃষ্টি।

৪. সাধারণীকরণ (Generalizing)

পাঠদানে সাধারণীকরণ হলো কোনো একক শিখন অভিজ্ঞতা, যা শ্রেণিকক্ষে শেখানো হয়েছে তা বাস্তবজীবনের একাধিক অভিজ্ঞতার সাথে এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রক্রিয়া।

৫. প্রয়োগ (Application)

শিক্ষাদান বা জ্ঞানদান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রেখে বরং শিখনকে শিক্ষার্থীদের জীবনে কার্যকরী করতে এর তাৎক্ষণিক প্রয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। শিক্ষক যা কিছু শেখান, তা যদি তাৎক্ষনিকভাবে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করাতে পারেন তাহলে ওই শিখন অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি স্থায়ী হয়।

আধুনিক পাঠপরিকল্পনার ত্রিসোপান

ফ্রেডরিক হার্বার্টের পঞ্চসোপানকে সংক্ষিপ্ত করে তিনধাপবিশিষ্ট পাঠপরিকল্পনার নকশা প্রবর্তন করা হয় যা বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আধুনিক পাঠপরিকল্পনাকে ত্রিসোপানিক পাঠপরিকলপনা বলে।

আধুনিক পাঠপরিকল্পনার এই তিনটি ধাপ হলো- ১. প্রস্তুতি, ২. উপস্থাপন এবং ৩. মূল্যায়ন।

১. প্রস্তুতি (Preparation)

একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কীভাবে উত্তম পন্থায় শিক্ষার্থীদেরকে নির্ধারিত পাঠের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান, পাঠের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করবেন, নতুন পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কীভাবে উৎসাহী করে তুলবেন ইত্যাদি হলো পাঠপরিকল্পনার প্রস্তুতি অংশের অন্তর্ভুক্ত।

কুশল বিনিময়, পূর্বজ্ঞান যাচাই, মজার কৌতুক বলা, ধাঁধা ছুড়ে দেওয়া, ছোট্ট গল্প বলা, কার্টুন দেখানো ইত্যাদি প্রস্তুতি পর্বের একেকটি কৌশল।

২. উপস্থাপন (presentation)

উপস্থাপন হলো শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তুলে ধরা এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা ও বিভিন্ন পদ্ধতি/কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদেরকে শিখনফল অর্জনে সহায়তা করা।

বক্তৃতা, আলোচনা, ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, ভূমিকাভিনয়, মাইন্ড ম্যাপিং ইত্যাদি পাঠ উপস্থাপনের একেকটি কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৩. মূল্যায়ন (assessment)

মূল্যায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাই করা হয়। মূল্যায়নকে কখনো কখনো প্রয়োগ বা অ্যাপলিকেশন (application) বলা হয়ে থাকে।

আদর্শ পাঠপরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য-

১। বিষয়বস্তু নির্বাচন করা;
২। উদ্দেশ্য নির্ধারণ;
৩। পাঠের বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন পর্বে বিন্যাস;
৪। কোন অংশের জন্য কতটুকু সময় প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা;
৫। শিক্ষার্থীদের জানা বিষয় থেকে পাঠ শুরু করে পরে অজানা বিষয়ে অবতারণা করা;
৬। যে সব বিষয় শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারে সেগুলো প্রথমে উপস্থাপন করে পরে কঠিন বিষয়ের দিকে যাওয়া;
৭। একটি বিষয় সম্পূর্ণ না বুঝিয়ে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বুঝালে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সহজে বুঝতে সক্ষম হয়।

একটি নমুনা পাঠপরিকল্পনা

	শিক্ষক পরিচিতি	পাঠ পরিচিতি
পরিচিতি	নাম: পরিচিতি মান: ———— শিক্ষাবর্ষ:—————	শ্রেণি: …… বিষয়: …. পাঠ: ……… পাঠ্যাংশ: আ-কার চিহ্নযুক্ত শব্দ ও বাক্য শোনা ও বলা পৃষ্ঠা নম্বর: ….. সময়: …. তারিখ: —————

শিখনফল	এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নের শিখনফলগুলো অর্জন করতে পারবে- শোনা: ১.১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে ও মনে রাখবে। ১.২.২ কারচিহ্নযুক্ত শব্দ মনোযোগ সহকারে শুনবে ও মনে রাখবে। ১.২.৩ কারচিহ্নহীন ও কারচিহ্নযুক্ত শব্দ দিয়ে তৈরী বাক্য শুনবে। বলা: ১.২.১ কারচিহ্নহীন শব্দ স্পষ্টভাবে বলতে পারবে। ১.২.২ কারচিহ্নযুক্ত শব্দ স্পষ্টভাবে বলতে পারবে।		
উপকরণ	পাঠ্যপুস্তক, আ-কার চিহ্নের বড় ছবি, আ-কার (া) যুক্ত শব্দের ছবি ও নামের তালিকা।		
শিখন-শেখানো কার্যাবলি			
সোপান	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
–	কুশল বিনিময়: শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করব।	শিক্ষার্থীরাও সাড়া দিবে	০২ মিনিট
প্র – স্তু – তি	আবেগ সৃষ্টিঃ ‘ক’ এ কলা, ‘খ’ এ খই এই ছড়া গানটি গাইব।	শিক্ষার্থীরাও সাথে গাইবে	০২ মিনিট
	শ্রেণিবিন্যাস: প্রয়োজনে শ্রেণিবিন্যাস করব।	শিক্ষার্থীরাও সাহায্য করবে	০১ মিনিট
	পূর্বজ্ঞান যাচাই: শিক্ষার্থীদেরকে গ্রীষ্মকালীন কয়েকটি ফলের নাম বলতে বলব।	তারা নিজেদের মতো করে বলবে	

	এবার তাদেরকে কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন করব। যেমন: ১। তোমরা কি ডাব দেখেছ ? ২। ডাবের রং কেমন ? ৩। ডাব গাছ দেখতে কেমন ? ৪। ডাব শুকালে কী হয় ? ৫। পাকা জামের রং কেমন ? ৬। জাম খেতে কেমন লাগে?	শিক্ষার্থীরা উত্তর বলার চেষ্টা করবে	০৪ মিনিট
	পাঠ ঘোষণা: তাদের উত্তরগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনব এবং না পারলে সহযোগিতা করব। তারপর আজকের পাঠ ঘোষণা করব এবং বোর্ডে পাঠের শিরোনাম লিখব।	–	–
উপকরণ প্রদর্শন	শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠা খুলতে বলব। প্রত্যেকে খুলতে পেরেছে কিনা তা লক্ষ করব।	শিক্ষার্থীরা ৪৪ পৃষ্ঠা খুলবে	০৩ মিনিট
পা ঠ উ প স্থা প ন	প্রথম ছবিটি শিক্ষার্থীদেরকে দেখাব এবং জানতে চাইব ছবিটিতে তারা কী দেখছে। এভাবে সবগুলো ছবি তাদেরকে দেখাব এবং প্রশ্ন করে তাদের কাছ থেকে জানতে চাইব তারা ছবিগুলো সম্পর্কে কী জানে । প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে তাদের সাথে ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। সবাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে কি না তা লক্ষ করব। এবার আমি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠটি পড়ে শোনাব। প্রতিটি লেখার নিচে আঙুল দিয়েশুদ্ধ উচ্চারণে , শ্রবণযোগ্য স্বরে তাদেরকে পড়ে শোনাব। ছন্দে ছন্দে তাদেরকে দুইবার বা তিনবার পড়ে শোনাব – কাকা যায়, ডাব খায়। খালা যায়, জাম খায় । শিক্ষার্থীদেরকে আমার সাথে ছন্দ ও তাল	তারা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। শিক্ষার্থীরা আমার সাথে ছন্দ ও তাল মিলিয়ে দুই –তিনবার পড়বে। শিক্ষার্থীরা আগ্রহ প্রকাশ করবে। শিক্ষার্থীরাও আমার সাথে উচ্চারণ করবে । তারাও আমার সাথে উচ্চারণ করবে।	২০ মিনিট

	মিলিয়ে দুই বা তিনবার পড়তে বলব। শিক্ষার্থীদেরকে বলব আমাদের আজকের পাঠটি নিয়ে একটি মজার গল্প আছে, তোমরা কি শুনবে? পুরো গল্পটি শিক্ষার্থীদেরকে পড়ে শোনাব। জ্যৈষ্ঠ মাস.................. তুলি গান গায় । স্বরবর্ণগুলোকে বর্ণ ছাড়াও যে অন্যভাবে চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে বলব । বড় কাগজে আঁকা আ-কার(া) চিহ্নটি তাদেরকে দেখাব এবং আ-কার (া) উচ্চারণ করে বলব। কয়েকবার বলার পরে শিক্ষার্থীদেরকেও আমার সাথে উচ্চারণ করে বলতে বলব । শিক্ষার্থীরা আ-কার চিহ্নটি চিনল কিনা তা জানার জন্য কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করব। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে কাকা, ডাব, খালা, জাম এগুলো বানান করে পড়ে শুনাব। ক আ-কার (া) কা ক আ-কার (া) কা কাকা, এভাবে। শিক্ষার্থীদেরকেও আমার সাথে উচ্চারণ করতে বলব।এভাবে কয়েকবার তাদেরকে অনুশীলন করাব। সবাই অনুশীলন করছে কিনা তা লক্ষ রাখব।	তারাও আমার সাথে অনুশীলন করবে।	

মূ ল্যা য় ন	দলীয় কাজ: শিক্ষার্থীদেরকে নীল,সবুজ ও হলুদ এই তিনটি দলে ভাগ করে দেব। প্রত্যেক দলকে তাদের পাঠ্যপুস্তক থেকে কাকা, ডাব,খালা, জাম এগুলো পড়তে দেব। একক কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজনকে এককভাবে জিজ্ঞেস করব। পাঠ থেকে আ-কার (া) চিহ্নটি দেখাতে বলব।পারলে প্রশংসা করব এবং না পারলে তাকে সহযোগিতা করব।	তারা মনোযোগের সাথে কাজটি করবে। শিক্ষার্থী বলবে।	০৫ মিনিট
সার সংক্ষেপ	আজকের পাঠ থেকে আমরা কী শিখলাম?- প্রশ্নটি করব	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।	০১ মিনিট
বাড়ির কাজ	(া) আ-কার চিহ্নটি শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ি থেকে দশ বার লিখে আনতে বলব ।	—	০১ মিনিট
পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা	ক্লাসের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উপকরণ গুছিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করব ।	—	০১ মিনিট

চেকলিস্ট অনুযায়ী শ্রেণি-কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন প্রদান

শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা ও মান উন্নয়নের জন্য পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করে নিয়মিত শ্রেণি পাঠ পরিচালনা হচ্ছে কি না তা চেকলিস্ট অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা ও ফলাবর্তন প্রদান করা প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকের একটি দায়িত্ব। এতে শিক্ষকের পাঠদানের মান যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ফলাবর্তন একটি শ্রেণিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রেণিপাঠদানে এর কার্যকারিতা অনেক।

- গুণগত পাঠদান ও কার্যকর শিখনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ;
- মূল্যায়ন করার কৌশল রপ্ত হয়;
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতার উন্নতি হয়;
- সমালোচনা বা নেতিবাচক মন্তব্য গ্রহণ করা যা মোকাবেলা করার প্রশিক্ষণ হয়;
- অর্জিত শিখনফল জানা যায়;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগ বৃদ্ধি করে;
- প্রশিক্ষণার্থীর মনোভাব বোঝা যায়;

- প্রশিক্ষণার্থীর চাহিদা নিরূপণ করা যায়।

সাধারণত নিচের নমুনা চেকলিস্ট ব্যবহার করে প্রধান শিক্ষক/ সহকর্মী শিক্ষকগণ ফলাবর্তন প্রদান করে থাকেন।

পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

শ্রেণি:	**বিষয়:**	**পাঠ শিরোনাম:**
শিখন শেখানো যোগ্যতা	শিক্ষক যা করেছেন (মতামত লিখুন বা টিকচিহ্ন দিন)	প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখুন
প্রস্তুতি পর্ব		
শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়		
শিখন পরিবেশ		
শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই		
পাঠ ঘোষণা		
পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লেখা		
উপস্থাপন পর্ব		
উপকরণ ব্যবহার		
বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি		
কাজের নির্দেশনার সহজবোধ্যতা		
শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দান		
শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা		
বোর্ড ব্যবহারে যা ছিল		
পাঠে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল		
শিখনফলের সাথে পাঠের সংযোগ		
মুল্যায়ন পর্ব		
মুল্যায়ন কৌশল		
মুল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা		
সময় ব্যবস্থপনা		
শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রণ		
ফলাবর্তন প্রদান		

পর্যবেক্ষকের নাম:............

তারিখ:...................

শিক্ষকের পাঠদানের মানোন্নয়নে ফলাবর্তনের গুরুত্ব

১. পাঠদানের সবল ও উন্নয়নের দিক চিহ্নিত করতে সাহায্য করে

ফলাবর্তন থেকে শিক্ষক জানতে পারেন—

- কোন অংশগুলো তিনি ভালো করছেন;
- কোথায় উন্নতি প্রয়োজন;
- কোন কৌশল শিক্ষার্থীদের শিখনে বেশি সহায়ক;
  এতে নিজ নিজ শিক্ষণ কৌশল পর্যালোচনা ও উন্নয়ন সহজ হয়।

২. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে

গঠনমূলক ফলাবর্তন শিক্ষকের—

- ক্লাস ম্যানেজমেন্ট;
- পাঠ উপস্থাপন;
- প্রশ্ন করার কৌশল;
- মূল্যায়ন পদ্ধতিইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।

৩. শিক্ষণে নতুন কৌশল ও উদ্ভাবনী চর্চা উৎসাহিত করে

সহকর্মী বা সুপারভাইজারের ফলাবর্তনে শিক্ষক জানতে পারেন নতুন পদ্ধতি বা আরও কার্যকর কৌশল।
যেমন—

- GRR (Gradual Release of Responsibility)
- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শেখানো
- সক্রিয় শিখন কৌশল
  এগুলো ব্যবহারে শিক্ষক আরও আধুনিক ও কার্যকর পাঠদান করতে সক্ষম হন।

৪. আত্ম-প্রতিফলন (Self-reflection) **উন্নত করে**

- ফলাবর্তন পাওয়ার পর শিক্ষক নিজের পাঠদানে কোথায় কোন পরিবর্তন আনা উচিত তা ভাবার সুযোগ পান। এটি শিক্ষককে আরও সচেতন, দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল শিক্ষক হতে সহায়তা করে।

৫. সহযোগী শিক্ষণ সংস্কৃতি গড়ে তোলে

ফলাবর্তনভিত্তিক পরিবেশে–

- শিক্ষকরা একে অপরের ক্লাস পর্যবেক্ষণ করেন
- পরামর্শ দেন ও নেন
- শিক্ষণ চর্চায় সহযোগিতা বাড়ে

এটি একটি পেশাগত শেখার সম্প্রদায় গড়ে তোলে, যা স্কুলের সামগ্রিক মান উন্নত করে।

শিক্ষকের পাঠদানের মানোন্নয়নে ফলাবর্তন হলো পেশাগত উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি শিক্ষককে কী ভালো হচ্ছে, কোথায় উন্নতি প্রয়োজন, কীভাবে আরও কার্যকর শিক্ষক হওয়া যায় তা বুঝতে সাহায্য করে। ভালো ফলাবর্তন

শিক্ষকের দক্ষতা উন্নত করে এবং শিক্ষার্থীর শেখার গুণগত মান সরাসরি বাড়ায়। এই ফলাবর্তন প্রদানের ক্ষেত্রে স্যান্ডউইচ মেথড বহুল প্রচলিত ও কার্যকর একটি কৌশল। স্যান্ডউইচ মেথড হলো এমন একটি ফলাবর্তন কৌশল, যেখানে মন্তব্য বা পরামর্শকে তিনটি স্তরে সাজানো হয়—

১. ইতিবাচক মন্তব্য (Positive feedback)
২. গঠনমূলক পরামর্শ বা উন্নয়নযোগ্য দিক (Constructive criticism)
৩. আবার ইতিবাচক, উৎসাহমূলক মন্তব্য (Encouraging feedback)

এটি ঠিক স্যান্ডউইচের মতো—দুই পাশে নরম ব্রেড (ইতিবাচক মন্তব্য), মাঝে ফিলিং (উন্নয়ন বা সংস্কারের বিষয়)।

স্যান্ডউইচ মেথডের তিন ধাপ

১. প্রথম স্তর: ইতিবাচক মন্তব্য

শিক্ষকের শক্তি বা ভালো দিকটি দিয়ে শুরু করা হয়।

উদাহরণ:

"আপনি আজ ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে খুব ভালোভাবে পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ব্যবহার করেছেন।"

২. দ্বিতীয় স্তর: গঠনমূলক পরামর্শ

মাঝখানে উন্নয়নের জন্য স্পষ্ট, নির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেওয়া হয়।

উদাহরণ:

"তবে গ্রুপ-ওয়ার্কের সময় কয়েকটি গ্রুপ কী করতে হবে তা ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। আপনি যদি শুরুতে আরও পরিষ্কার নির্দেশনা দিতেন, তাহলে তারা আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারত।"

৩. তৃতীয় স্তর: উৎসাহমূলক ইতিবাচক মন্তব্য

শেষে আবার উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস জাগানো মন্তব্য।

উদাহরণ:

"আপনার ক্লাসের উদ্যম খুব ভালোএবং আপনি ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন—যদি একটু নির্দেশনা পরিষ্কার করা যায়, আপনার ক্লাস আরও অসাধারণ হবে!"

স্যান্ডউইচ মেথড হলো শিক্ষককে ফলাবর্তন দেওয়ার একটি সম্মানজনক, কার্যকর এবং সম্পর্ক-বান্ধব কৌশল, যেখানে ইতিবাচক–উন্নয়ন–ইতিবাচক এই ক্রমে মন্তব্য করা হয় যাতে শিক্ষক পরামর্শ সহজে গ্রহণ করতে পারেন।

পরিশেষে একটি সফল শিক্ষণ- শিখন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে বাংলা ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে একটি পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন, চেকলিস্ট অনুযায়ী শ্রেণি-কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সেই অনুযায়ী ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।

অধ্যায় ১২

বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তু মূলত কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ভাববস্তুর ওপর রচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছবির পাঠ, ছবি ও গল্প পাঠ, ছড়া, আঁকাআঁকি, বর্ণ পাঠ, কার ও ফলা চিহ্নের পাঠ, যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে ভাষা দক্ষতাগুলোর উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ে যে ভাববস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো দেশপ্রেম/ দেশাত্মবোধ, গ্রামীণ ও নগর জীবন, প্রকৃতি, অভিযান, ভ্রমণ, খেলাধুলা, দেশ-পরিচয়, পোষা-অপোষা পশুপাখি ও জীবজন্তু, নদী-সাগর-পাহাড়, মহৎ জীবন, অধ্যবসায়, শিষ্টাচার, মানবপ্রেম, মাতৃভাষা, ভাষা-আন্দোলন, জাতীয় দিবস, নৈতিকতা, সমাজ জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, নিরাপদ জীবনযাপন। এ অধ্যায়ে বাংলা শিক্ষাক্রমের অলোকে বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

নির্দিষ্ট কোনো ভাববস্তু অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনে লেখক সাধারণত কতকগুলো মাধ্যম ব্যবহার করেন। এ মাধ্যমগুলো হচ্ছে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কথোপকথন, চিঠি, দরখাস্ত ইত্যাদি। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য এগুলো হচ্ছে সাহিত্যরূপ। কোনো বিষয়বস্তুতে শিল্পরূপ দানের জন্য ভাষার যে আঙ্গিক নির্মাণ করা হয় তাই সাহিত্যরূপ। এই রূপগুলো একে অপরের থেকে আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন এ সাহিত্যরীতি বিষয়বস্তুর আদল ও আবেদন দুইই পাল্টে দেয়। বিষয়বস্তুর এই ভিন্নতা সাহিত্যের অত্যন্ত পরিচিত একটি রূপ। ভিন্ন বিষয়বস্তু শিশুর ভাষা শিখনে বৈচিত্র্য আনে।

ভাববস্তু অনুযায়ী বিষয়বস্তুর এই বিভিন্নতা শিক্ষার্থীর শিখনে যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি শিক্ষকের শেখানোর ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকের সচেতন থাকা খুবই প্রয়োজন। কেননা ছড়া বা কবিতা যেমন করে পড়াতে হবে তেমনি করে কি গল্প বা প্রবন্ধ পড়ানো যায়? আবার সব গল্পই কি একই ঢঙে পড়ানো যায়? না। কেন এমনটি হয় আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি? বস্তুত শিক্ষক বিষয়বস্তুর বর্ণনা অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করে থাকেন।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এই ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে আসলে কী শেখে? এই বিষয়বস্তুগুলোর মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা কতকগুলো শিখনফল তথা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করে। মূলত এই অর্জন শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার মাধ্যমে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা কেবল সাহিত্য পড়ে তার অন্তর্নিহিত ভাবই বোঝে না বরং সাহিত্যের মাধ্যমে অপরাপর ভাষাদক্ষতাগুলোরও উন্নয়ন করে। ভাষাচর্চা ও সাহিত্যবোধের বিকাশের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে ক্রমসম্প্রসারণশীল মূল্যবোধের জন্ম নেয়। এই মূল্যবোধ তাকে জীবনের পথে নতুন দিশা দেয়।

বাংলা শিক্ষাক্রমের আলোকে বাংলা পাঠ্য পুস্তক পর্যালোচনা

আমরা যদি প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে এখানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। যেমন-

- ছবিতে কথা/গল্প, ছবির পাঠ;
- ছড়া;
- আঁকাআঁকি;
- বর্ণ পাঠ;
- কার চিহ্নের পাঠ;
- কবিতা;
- গল্প ও প্রবন্ধ;
- কথোপকথনধর্মী পাঠ;

- শব্দের খেলা।

এটি দেওয়ার অর্থ হলো প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে এ ধরনের পাঠ আছে। অর্থাৎ শিক্ষক যদি উল্লিখিত ধরনের একটি পাঠের ওপর শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করতে পারেন তাহলে ঐ ধরনের অন্য পাঠ পরিচালনা করা তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। একটি মজার ব্যাপার হলো যত ওপরের শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা যাবে, দেখা যাবে পাঠের এই ধরনের ভিন্নতার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু মূলত: কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধকে ঘিরে রচিত বা সংকলিত হয়েছে। এখান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, কোনো শিক্ষক যদি প্রথম শ্রেণির বিষয় উপস্থাপনে দক্ষ হতে পারেন, তাহলে তিনি অন্য শ্রেণিতে খুব সহজেই পাঠ উপস্থাপনে দক্ষ হয়ে উঠবেন।

পাঠ-সংশ্লিষ্ট অনুশীলনীর পর্যালোচনা

- প্রতিটি বিষয়ের অনুশীলনীতে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ আছে। যেমন –
- একটি কবিতার অনুশীলনীতে ‘পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা;
- অর্থ বলা;
- খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা;
- মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা;
- যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে লেখা;
- যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া;
- বহুনির্বাচনী প্রশ্ন;
- কবিতা পড়া;
- কবিতাটি লেখা ইত্যাদি কাজ রয়েছে।

আবার অন্য কোনো একটি গল্প বা কবিতায় নতুন ভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ রাখা হয়েছে। এভাবে যদি সব বিষয়ের মূল্যায়ন পদ একত্র করা যায় তাহলে দেখা যায় একটি শ্রেণির শিখনফলের আলোকে মূল্যায়ন পদের সংখ্যা অনেক। এগুলো হলো-

- বাক্য বলা ও লেখা;
- পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা;
- শব্দের অর্থ বলা ও লেখা;
- খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা;
- পড়া ও নিজের ভাষায় বলা;
- মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা;
- ছবির নিচে শব্দ লেখা;
- যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা;
- যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া;
- মিল করা;
- পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা;
- কবিতা আবৃত্তি করা;
- মুখে মুখে গল্প বলা;
- নামবাচক শব্দ বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা;
- শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা;
- একই অর্থের শব্দ জানা;

- বিরামচিহ্নের ব্যবহার;
- কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা;
- শব্দ খুঁজে মালা বানানো;
- প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা;
- বাক্য জুড়ে বাক্য তৈরি করা;
- ছক পূরণ করা;
- ক্রমবাচক শব্দ বলা;
- পড়া ও লেখা;
- বানান ও অর্থের পার্থক্য করা;
- সংকেত জেনে নেওয়া;
- ছবি দেখে গল্প তৈরি করা;
- গল্প শোনানো ইত্যাদি।

একটি পাঠের বা বিষয়বস্তুর জন্য যে সকল মূল্যায়ন পদ রাখা হয়েছে কেবল সেগুলো অনুশীলন করাতে পারলেই শিক্ষার্থীর অর্জন নিশ্চিত হবে। আসলে বিষয়টি এরকম নয়। বাংলা বিষয়ে ঐ শ্রেণিতে যতগুলো মূল্যায়ন পদ নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রযোজ্য সব ধরনের মূল্যায়ন পদ শিক্ষার্থীকে অনুশীলন করানো আবশ্যক। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় তৃতীয় শ্রেণির 'আমি হব' কবিতার অনুশীলনীতে যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে লিখি এর অনুশীলন নেই। কিন্তু আনন্দের দিন গল্পে যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে লিখি অনুশীলন রাখা হয়েছে। এখানে এমনটি ভাবার অবকাশ নেই যে, আনন্দের দিন গল্পে যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে লিখি শিখলেই ঐ শ্রেণির এ-সম্পর্কিত সব অর্জন শেষ হবে। সে কারণে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ে শিক্ষাক্রমের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য একটি পরিকল্পনা আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে। ভাষা দক্ষতার বিকাশে ভাষিক কাজগুলো ধাপে ধাপে পরিকল্পিতভাবে করতে হয়। তবে একটি পাঠে শিক্ষক সবগুলো ভাষিক কাজের মূল্যায়ন করবেন না। শিখন শেখানো কার্যক্রম শেষে ঐ শ্রেণির জন্য যেসকল মূল্যায়ন পদ নির্ধারণ করা হয়েছে ঐ বিষয়বস্তুর জন্য প্রযোজ্য সবগুলো কার্যক্রম ধাপে ধাপে অনুশীলন ও মূল্যায়ন করবেন ।

প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি দেশপ্রেম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা প্রভৃতি ভাববস্তু আত্মস্থ করার সুযোগ পাবে। সেই সাথে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনবোধেরও প্রতিফলন ঘটাতে পারবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে মাতৃভাষা ব্যবহারে দক্ষ হতে পারবে। শিক্ষকগণ এ বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে শিখন শেখানো কার্যাবলিতে পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার করবেন।

তথ্য-উৎস

১. নরেন বিশ্বাস (১৯৯০), বাংলা একাডেমি বাঙলা উচ্চারণ অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২. রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (প্রথম খন্ড, ২য় সং. পুমু, জুলাই ২০১৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা
৩. মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৭৫), ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বর্ণমিছিল, মিউনিসিপ্যাল স্ট্রীট, ঢাকা
৪. মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (পুমু ২০১৯), বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০
৫. শামসুল কবীর ও অন্যান্য (২০০২), সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
৬. ড. বেগম জাহান আরা (২০০২), বাংলা উচ্চারণ : বিধি ও রীতি, হাসি প্রকাশনী, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১০০০
৭. মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ ও অন্যান্য (পরি.সং), (২০২৫), পরিমার্জিত ডিপিএড উপমডিউল ৩.৩ বাংলা তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
৮. জ্যোতিভূষণ চাকী (১৯৯৬), বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৯. হায়াৎমামুদ (২০০৩), বাংলা লেখার নিয়ম কানুন, প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা।
১০. ড. মাহবুবুল হক (২০১৬), বাংলা বানানের নিয়ম, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
১১. ড. সৌমিত্র শেখর (২০১০), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, অগ্নি পাবলিকেশনস ,ঢাকা।
১২. ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন: বাংলা (২০২০), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ।
১৩. পরিমার্জিত ডিপিএড: বাংলা (২০২৫), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ।
১৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম (প্রাথমিক স্তর), ২০২৫ (পরিমার্জিত)
১৫. হোসেন, শেখ আমজাদ ও রহমান, মোঃ মুজিবুর, শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল, প্রভাতী লাইব্রেরি,বাংলাবাজার, ঢাকা
১৬. মালেক, মরিয়ম, ইসলাম ও রিয়াদ, শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, র‍্যামন পাবলিসার্স, ঢাকা
১৭. রহমান, মোঃ মুজিবুর, শ্রেণি পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, প্রভাতী লাইব্রেরি, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা
১৮. আলম, ফ. & আহমেদ, স. (২০১৮)। বাংলা ভাষা শিক্ষণের বর্তমান প্রয়াস: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা, বাংলাদেশ এডুকেশন রিসার্চ নেটওয়ার্ক, ঢাকা
১৯. চৌধুরী, আ. র., & কবির, ম. হ. (২০১৭), প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠদক্ষতা উন্নয়ন: পাঠক্রম ও পাঠ্যবই বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ জার্নাল অব এডুকেশন
২০. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১৬), বাংলা শিক্ষা কোষ: প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা কাঠামো, এনসিটিবি, ঢাকা
২১. শ্রীশচন্দ্রদাশ, সাহিত্য সন্দর্শন, সুচয়নী পাবলিশার্স
২২. বাংলা প্রাথমিক পাঠদক্ষতা উন্নয়ন: বেসলাইন ও এন্ডলাইন জরিপ প্রতিবেদন। রুম টু রিড, ঢাকা